সাহিত্য-প্রবাহ

* * *

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ

বাংলা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক,

সেণ্ট জেভিয়াস´ কলেজ, কলিকাতা

* * * *

প্রাপ্তিস্থান :

এ. মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড

২, কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

এ গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা পেয়েছি অধ্যাপনা করতে গিয়ে, সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রধানতঃ আমি সমালোচনা-চ্ছলে সাহিত্যরস-উপভোগের আনন্দই প্রকাশ করতে চেয়েছি। প্রবাসী, পরিচয়, বঙ্গশ্রী, প্রবর্ত্তক প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে সেগুলিকে একত্র সংগ্রহ করবার ইচ্ছে অনেকবার মনে জেগেছে, কিন্তু সে ইচ্ছে এতদিন পূর্ণ করতে পারিনি। কোন-কোনটি কোন্ কাগজে কবে প্রকাশিত হয়েছিল তাও মনে নেই, এইজন্য উল্লেখ করতে পারিনি

অনুজ-প্রতিম ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমারের ঐকান্তিক আগ্রহের ফলেই এ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হ'ল। নইলে হয়তো কোনদিনই হ'তনা। তার উৎসাহ-উদ্‌যোগ চিরদিন আমার স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

ভুলত্রুটি যা র'য়ে গেল, তার জন্য আমিই দায়ী।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ
কলিকাতা,
৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৫৮

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

সাহিত্য-প্রবাহ

—————:০:—————

কাব্যকথা

যে দূরান্তের মোহখানি এতদিন শরতের আকাশে ভাসছিল, তা আজ নেই। দিগন্ত শিশির-শীতল এবং কুহেলি-মন্থর হয়ে এসেছে। শরতের রূপ যেন কৈশোরের মত'; অনাগত যৌবনের দূর মোহখানি তার নির্ম্মল আকাশে আভাসিত হয়ে ওঠে। শীতের সৌন্দর্য বড়ই পরিপূর্ণ, বড়ই স্থির।

শরতের এই মোহময় রূপ কতবার আমাকে মুগ্ধ ক'রে গেছে। তার হাওয়ায়-কাঁপা আলোয়-ধোওয়া কাশের 'বন নদীর কূলে-কূলে বুনো পাখীর ডাকে মুখরিত হয়ে উঠেছে, সোনার রোদ ধরিত্রীর বুকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে, শিউলির বন রাশি রাশি ঝরাফুলে ভরে' উঠেছে, বাতাস তার গন্ধ লুটে নিয়ে আকাশ-পথে উড়ে গিয়েছে, কতদিন কতবার বিহ্বল হয়ে তার রূপের সুধা পান ক'রেছি।

সে রূপের জগৎ এই প্রয়োজনের জগৎ থেকে কত দূরে! যে জগতে দু'মুঠো অন্নের জন্যে মানুষের কষ্টের সীমা নেই, রোজকামিনেরা লোহার কারখানায় খেটে খেটে হয়রান হচ্ছে, শীর্ণা ভিখারিণী রোগা মেয়েটিকে নিয়ে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে জগৎ, আর এই জগৎ কত ব্যবধান!

কিন্তু এই রূপের জগৎ আছে বলে'ই মানুষ দুঃখকষ্টের মধ্যেও একটু শান্তি পায় ; দিনরাত্রির হিসেবের বাইরে একটু খোলা হাওয়া পেয়ে বাঁচে।

প্রত্যেকের বুকেই দু'টি ক'রে মানুষ আছে, একটি কেজো মানুষ, সে প্রয়োজনের কাজ গুছোয় ; আর একটি স্বপ্নচারী পথিক, সুরের নেশায় মন মাতিয়ে দেওয়াই তার কাজ। এই দ্বিতীয় মানুষটি কারও মনে ঘুমোচ্ছে, কারও মনে ঝিমোচ্ছে, কারও মনে বা কেবলই বাঁশী বাজিয়ে চলেছে।

এই স্বপ্নচারী পথিকের বাঁশীই কবিকে, চিত্রীকে, শিল্পীকে উতলা ক'রে তোলে। বাইরেকার জগৎ তাই তাঁদের কাছে ইঁট কাঠ পাথরেই ভরে' নেই, এরও ভিতরে তাঁরা দেখছেন সৌন্দর্য ; ধরিত্রীর বুকের গান তাঁদের কানে পৌঁছোচ্ছে, পৃথিবীর মুখের আলো তাঁদের চোখে লাগছে। তাঁরা দেখতে পান কোন্ প্রাণধারা মাটির বুকে লীলায়িত হয়ে বয়ে চলেছে, রূপমাধুরী রৌদ্রালোকে উপচে পড়ছে, লাবণ্যতরঙ্গ জ্যোৎস্নার স্রোতে দুলে' উঠ্‌ছে। সমস্ত জগৎ তাঁদের কাছে আভাসে-ইঙ্গিতে ভরপুর।

এই রহস্যদৃষ্টি শিল্পসৃষ্টির মূলে। যেদিন বিস্তীর্ণ সমুদ্রের কূলে নবোদ্‌গত বালুকা-বেলায় দাঁড়িয়ে প্রথম সূর্যালোকস্নাত নীল জলরাশির পানে চেয়ে মানুষ বিস্ময় অনুভব করেছিল, সেইদিনই কাব্যের প্রথম সূত্রপাত। তার বিস্ময় কতদিন পরে ভাষা পেয়েছিল কে জানে ? কিন্তু ঐ বিস্ময়কে ভাষা দিতে গিয়েই শিল্পের জন্ম।

কাব্যের উপকরণ যাই হোক, বিস্ময়-বোধের তীক্ষ্ণতা ও তাকে প্রকাশ করবার শক্তি, এই তার প্রধান সম্পদ্। এই যান্ত্রিক যুগ নিয়েও কাব্যরচনা সম্ভব,—যদি কবি এর দীপসজ্জায়, সৌধমালায়,

নরনারীর গতিলীলায় ও মনের অরণ্যের বিচিত্র রৌদ্রছায়ায় গভীর বিস্ময় অনুভব করেন। শেলী-কীট্‌সের পথে যাননি ব'লে হুইটম্যান কিছু অকবির দলে গিয়ে পড়েননি।

অনন্তকে রূপে বাঁধবার জন্যেই কবির, শিল্পীর চিরন্তন সাধনা। যে কবি-মানস অতীত যুগে অনন্তকে মূর্ত্তিতে, প্রতিমায় বাঁধতে চেয়েছে, আজ যুগান্তর পরেও সেই কবি-মন চিত্রে, ভাস্কর্যে, সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করছে।

……শরতের স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের এই রহস্যাভাস ক্ষণেকের জন্য ধরা দিয়ে গেল। আবার ফুটে উঠ্‌ল চোখের সাম্‌নে যৌবন-মন্থর শীতের প্রকৃতি, ফিরে এলো উত্তুরে হাওয়ার উতল ক্রন্দন, দেখা দিল ঘাসে ঘাসে নিশার শিশিরাশ্রু।

['ভাবীকাল', কার্ত্তিক, ১৩৪১]

জীবন

সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে সওদাগর যেতেন দেশ-দেশান্তরে জাহাজ বোঝাই মণিমাণিক্য নিয়ে। আমার ভালো লাগে তেমনি মনের সাগরে সওদাগরি করে' ফিরতে। মানুষে-মানুষে অন্তরের যে পরম ঐক্য, তাকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করবার সাধনা না করে' আমরা মূর্খের মত কতই না ব্যবধান সৃষ্টি করছি দিনের পর দিন! ভাবের রাজ্যে তরী ভাসিয়ে মানুষের দিন চলেনা জানি, কিন্তু বাস্তব জীবনেও কি আমরা লাভবান্ হচ্ছি এই ব্যবধান সৃষ্টি করে'?

লাভ ক্ষতি সব কথারই অর্থ আপেক্ষিক। আমি যাকে লাভ মনে করছি, আর একজন হয়তো তাকে লাভ বলে' মনে না'ও করতে পারে। কিন্তু তথাপি উচ্চতর জীবনের যে আদর্শের প্রতি মার্জিত-রুচি মানব শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে এতকাল, তাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। সেই আদর্শকে সমাজে মূর্ত করে' তুলতে পারলে তাকে পরম লাভ বলে'ই আমরা গণ্য করবো, আর তার বাধা ঘটলে মনে করবো মহাক্ষতি।

কত সহিষ্ণুতা, কত ধৈর্য, কত ত্যাগ, কত আত্মবিশ্লেষণ আবশ্যক মানুষকে চিনতে হলে! এই সর্বগ্রাসী জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত মানুষের কতটুকু আছে সে সুযোগ, আর কতটুকু আছে সে উৎসাহ?

জীবনে নেই অবসর, মুহূর্তকাল চুপ করে' ভাববার অবকাশ। স্বপ্ন, কল্পনা, আদর্শ তাই মাথা তুলতে পারেনা। শিক্ষিতের মনও নিরালোক আবেষ্টনে যেন আপনা হতেই অসাড় হয়ে আসে।

ছুটির দিন, শীতের সকাল। প্রভাত রৌদ্রের ঈষদুষ্ণ স্পর্শ বেশ মনোরম লাগছে। বিখ্যাত ফিনিশ ঔপন্যাসিক সিলান্‌পা'র 'মীক হেরিটেজ' পড়ছিলাম। কত দূরের দেশ ফিন্‌ল্যাণ্ড, বর্তমানে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবর্তে আলোড়িত ফিন্‌ল্যাণ্ড। অথচ আপন অন্তরে অনুভব করছি দরিদ্র নায়ক জুসি'র ভাগ্যবিড়ম্বনার বেদনা। মনে হচ্ছেনা তো সে দূরের বা একান্ত পর। এমনকি, তুষার দেশের সেই শীতের রাত্রি, ঘোলাটে দিন, স্বপ্নালু সন্ধ্যা যেন মূর্ত হয়ে উঠছে আমার মনে। পেন্‌জামির মৃত্যুর পর অসহায় দরিদ্র বিধবা মাইজা সন্তানটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সংসারের অজানা পথে। সুকঠোর জীবন-সংগ্রাম বেশিদিন সহ্য হলোনা তার। লাজুক ছেলে জুসি ভাসলো আপন নিয়তির স্রোতে। কখনও চাষের কাজে, কখনও বনে বনে কাঠ কেটে তাকে করতে হয়েছে জীবিকার সংস্থান। লাজুক, মুখচোরা ছেলে সে, সবাই দেখে তাকে অবজ্ঞার চোখে, দলের মধ্যে থেকেও সে দল-ছাড়া।··· এলো স্বপ্নময় যৌবন। কে জানে কি করে' সে রীণাকে ভালোবেসে ফেললো, বিয়ে করলো তাকে। তারপর অবিরাম দুঃখের ঢেউ ঠেলে ঠেলে উজান পথে এগিয়ে চলা, দিনের পর দিন অশ্রান্ত সংগ্রাম, নিত্য অশান্তির বিক্ষোভ। এমনি করে' ক্রমে ঘনিয়ে আসে অবসাদ। রীণা মারা গেল। জুসি, বৃদ্ধ জুসি আবার সংসারে একা।

বহুকাল-প্রবাসী পুত্রের প্রভাবে কর্মহীন লক্ষ্যহীন সন্তান-স্নেহ-তৃষিত জুসি জড়িত হয়ে পড়লো শ্রমিক আন্দোলনে এবং সম্পূর্ণ বিনা দোষে তার সারল্যের অপরাধে দণ্ডিত হলো মৃত্যুদণ্ডে। ভাগ্যহীন জীবনের ক্ষীণ প্রদীপ-শিখা নিবে গেলো পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তে। কত জীবন-নাটকের এমনি করে'ই যবনিকা পতন ঘটছে পৃথিবীময়,

কে তার খোঁজ রাখে! অথচ মানব-জীবন কি এতই মূল্যহীন, এতই তুচ্ছ? তার সুখদুঃখ, তার সংগ্রাম, তার আশা আকাঙ্ক্ষা, তার স্বপ্ন—আমার যে মনে হয় অমূল্য সম্পদ্। তাই সাহিত্যের সাগরে, মানব-মনের এই অকূল সমুদ্রে আমি করি সওদাগরি, যা দেখি, তাই ভালো লাগে। কত ভবঘুরে পথিকের চঞ্চল পদধ্বনি, কত প্রীতিস্নিগ্ধ সংসারচিত্র, কত বিভিন্নমুখী আবেগের ঘাত-প্রতিঘাত—আমাকে মুগ্ধ করে, আবিষ্ট করে; আমি নিজেকেই যেন প্রতিফলিত দেখি মহা-জীবন-নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায়। ভৌগোলিক, সামাজিক সকল প্রভেদ কোথায় মিলিয়ে যায়, আমি দেখি এক অখণ্ড জীবন-সাগর বিচিত্র তরঙ্গলীলায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

[মন্দিরা, মাঘ, ১৩৪৬]

জাপানী কবিতা

জাপানকে আজ আমরা প্রধানতঃ জানি সাম্রাজ্যগর্ব্বী, বাণিজ্য-নিপুণ, রণকুশল দেশ—পশ্চিম পৃথিবীর প্রিয়শিষ্যরূপে। কিন্তু যাঁরা তা'র অন্তর-লোকের সন্ধান রাখেন, তাঁ'রা জানেন, সে শুধু সোনার খনির সন্ধানীই নয়; 'ফুজিয়ামা'র আগুন-শিখায়, মেঘলোকের মোহন মায়ায়, চেরীফুলের প্রগল্‌ভ হাস্যোচ্ছ্বাসে তা'র কবি-নয়ন চিরমন্ত্রমুগ্ধ। বাস্তব উন্নতির পাশাপাশি মধুর, কোমল তা'র স্বপ্নলীলা চলেছে। আরও, এটি লক্ষ্য করবার বিষয় বলে' মনে হয় যে, ইউরোপে যন্ত্রযুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য হ'য়ে পড়েছে তত্ত্বকণ্টকিত, সমস্যাসঙ্কুল, চিন্তাভার-পীড়িত; কিন্তু জাপানের বৈজ্ঞানিক উন্নতি সত্ত্বেও সাহিত্যে তা'র রূঢ় স্পর্শ তেমন প্রকট হয়ে ওঠেনি।

জাপানী কাব্যলোক এক অপূর্ব্ব স্বপ্নরাজ্য, নানা রঙে রঙীন রামধনুর দেশ। বিচিত্রবর্ণ, চঞ্চল, ফুলে-ফুলে-ওড়া প্রজাপতির মত ছোট, সুন্দর কবিতাগুলি; সাগরের বিশালতা বা পর্ব্বতের তুঙ্গতা নেই এতে; শিশিরবিন্দুর মত স্নিগ্ধোজ্জ্বল, আকাশের আলো হাসে তার বুকে; তেমনি শিথিল ও সংক্ষিপ্ত, যেন ছুঁলেই ঝরে' যাবে, অথচ দূর থেকে দেখলে জুড়িয়ে যাবে চোখ।

জাপানী কবিতার যে বৈশিষ্ট্য সর্ব্বপ্রথমেই চোখে পড়ে, সে হচ্ছে তা'র সংক্ষিপ্ত আকার। বেশী কথা বলা জাপানীরা ভালোবাসে না। তা'রা জানে, মনের কথা বাক্যের ফেনিল উচ্ছ্বাসে কোথায় হারিয়ে

যায়, আভাসে ইঙ্গিতেই তা'র প্রকাশ হয়. সুন্দর। বিখ্যাত জাঁপানী কবি ইয়োনে নোগুচি তাঁর "জাপানী কবিতার মর্ম্মকথা" (The Spirit of Japanese Poetry) বইয়ের প্রারম্ভে বলেছেন: "আমার বরাবরই মনে হয়, ইংরেজ কবিরা বহু পরিশ্রম অপব্যয় ক'রে ফেলেছেন কথার পিছনে। কেবল কথা আর কথা! অনিচ্ছায় হ'লেও, বাক্য-জালে তাঁ'রা যে বক্তব্য বিষয়কে অনেক সময়ে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছেন তাতে সন্দেহ নেই।"

জাপানী কবিতায় এই কথার অত্যাচার নেই। তাতে আছে শুধু ইঙ্গিত, মনের গভীর আলোড়ন থেকে যেমন চোখের কোণে দেখা দেয় একবিন্দু অশ্রু, সন্ন্যাসীর অতল প্রশান্তি যেমন ফুটে ওঠে ওষ্ঠপ্রান্তের স্মিতরেখায়, জাপানী কবিতা তেমনি অসীম মাধুরীকে লুকিয়ে রাখে সূক্ষ্ম কণিকায়; বলার বাতায়ন-পথে দেখা দেয় না-বলার বিশাল জগৎ।

আর একটি বৈশিষ্ট্য, প্রতিদিনকার জীবনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সংযোগ; প্রতি মুহূর্ত্তে যে রূপমাধুরী ফুটে উঠছে ফুলের বনে, ঝলকে উঠছে পাখীর পাখায়, তাকেই এরা এঁকে রেখেছে রঙে আর রেখায়। দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক রহস্য নয়, কঠিন পরমার্থ তত্ত্ব নয়, এ যেন পথিকের পথ-চলার গান; দু'ধারের ফুল কুড়িয়ে আঁচল ভরে' নিয়ে চলেছেন কবি—মুগ্ধ, আপনাহারা।

এই স্বাভাবিকতা, এই সহজ স্বাচ্ছন্দ্য জাপানী কাব্যলক্ষ্মীর মনোরম লাবণ্য। জাপানের পথে যে চলে, সে-ই বুঝি গান গেয়ে যায়, জীবনময় তার সৌন্দর্য্যের উপাসনা। সমগ্র জাতির এই সৌন্দর্য্যবোধ এবং জীবনে তাকে রূপ দেবার চেষ্টা মুগ্ধ করেছিল কবি রবীন্দ্রনাথকে। জাপানের কাব্যপ্রীতি সম্বন্ধে লাফকেডিয়ো হার্ণ বলেছেন: "বাতাসের

মতই কবিতা জাপানে সার্ব্বজনীন। সবাই এখানে অনুভব করে কবিত্ব, পড়ে এবং লেখে কবিতা। এবিষয়ে ধনী দরিদ্র বা বড় ছোটর কোন পার্থক্য এদেশে নেই।" ঈষৎ অতিরঞ্জিত হ'লেও তাঁ'র কথা অনেকটা সত্য।

(২)

প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য জাপানী কবিতার প্রধান উৎস। তার ঋতুলীলার প্রতি ইঙ্গিত, প্রতি ভঙ্গিমা এঁকে গিয়েছেন কবির পর কবি—কাব্যেতিহাসের বিভিন্ন যুগে। কিন্তু কত বিচিত্র তার সুর, কত কবির মনের তারে কত নূতন সুর বেজে উঠেছে প্রকৃতির মায়াময় স্পর্শে! অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন বুসোন্ ইয়োসানোর বর্ষার গান:

"বরষা রিম্‌ঝিম্ ঝরে অঝোর!
ফুরানোর বাঁশী শোনো বাজিছে জলধারায়
প্রাচীন বয়সের শ্রবণ মোর।"

জীবন-সন্ধ্যায় সব-হারানোর, সব-ফুরানোর গান শুনেছেন কবি বর্ষার জলধারায়। যেমন উজাড় ক'রে দিচ্ছে আকাশ আজ নিজেকে, তেমনি আপনাকে আজ উজাড় ক'রে দেবার দিন যে এলো; রিম্‌ঝিম্, বর্ষারাত্রি ঘনিয়ে আসে।

আবার পুরাকালের নারীকবি কোমাচি লিখেছেন বেদনামন্থর বর্ষায়:

"ফুলেরা ঝরিল বরষায়
প্রিয় মোর হারাল কোথায়?
আলসে চাহিয়া রহিলাম,
প্রিয় মোর গেল সে কোথায়?"

বলা যা হ'য়েছে, তার অনেক বেশী ঘনিয়ে আসছে মনে, দ্বার-পথে যেন দেখছি দুর দিগন্ত।

আগ্নেয়গিরি 'ফুজিয়ামা' বা 'ফুজি-সান' চিররহস্যে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে এদের চোখে। কখনও এর রূপ শান্ত স্থির, তুষারশুভ্র,—কখনও অগ্নিশিখায়, ধূম্রোচ্ছ্বাসে ভয়ঙ্কর। এর শান্ত স্নিগ্ধ রূপ দেখে কবি আকাহিতো বল্‌ছেন :

"তাগো-র তীরে তীরে
ক'রেছি বিচরণ ;
ফুজির গিরি শিরে
তুষার আবরণ।"

আবার অজ্ঞাত কোন কবি লিখে গিয়েছেন :

"সুরুগা আর কাই জুড়ে, দাঁড়িয়ে আছে
উত্তুঙ্গ ফুজি পর্ব্বত ;
আকাশের মেঘেরা থম্‌কে থাকে দাঁড়িয়ে,
পার হ'তে সাহস করে না এর উন্নত শিখর।
পাখীরা উড়তে পারে না এর চূড়ার উপর।
তুষারের অশ্রান্ত বর্ষণ
চাইছে এর জ্বলন্ত আগুন নেবাতে,
আর জ্বলন্ত আগুন এর বুকের
চাইছে এই পড়ন্ত তুষার গলাতে।
এ যেন কোন্ অনাম দেবতা,
চিরকালের বিস্ময় মানুষের,
রূপ যার আঁকা যাবেনা কোনদিন।

সে-নো-উমি নামে বিশাল হ্রদ
লুকিয়ে আছে এই পাহাড়ের বুকে ;
ফুজি-গাওয়া নামে বিশাল নদী,
নাবিকেরা যা ভয়ে ভয়ে পার হয়,
—বেরিয়ে এসেছে তারই জল থেকে।
এ যেন সেই বিধাতৃপুরুষ
অনন্ত কাল চেয়ে আছেন
সূর্যোদয়ের দেশ এই ইয়ামাতোর,
আমাদের জাপানের পানে।
এ পাহাড় তার পবিত্র সম্পদ্,
তার চিরন্তন গৌরব।
যুগযুগান্ত ধ'রেও দেখে দেখে
ক্লান্ত হয়না চোখ,
সুরুগায় এই ফুজি পাহাড়ের চূড়া।"

বসন্ত আসে জাপানে, কুয়াশায় আব্ছা থাকে আকাশ, তুষার তখনও গলেনি, মাঝে মাঝে ঝরে বৃষ্টিধারা, চাঁদ ওঠে অস্পষ্ট আকাশে —স্বপ্নরাজ্যের ছবির মত, ভোরের বেলায় বাগানে বাগানে প্রজাপতির মেলা, বুনোহাঁসের দল উড়ে চলে' যায় উত্তর মুখে, চেরীফুল আর প্লামের মুকুলে ছেয়ে যায় দিক্‌দিগন্ত, উগুইস্থ পাখীর সুমিষ্ট গান সুরের মাধুরী ছড়ায় বনে বনান্তে, আসে উৎসবের দিন।

"বসন্ত এলো, আজ
পাহাড় সবুজ,
শুধু ফুজির চূড়ায়
আজো শুভ্র তুষার।"

(সম্রাট মেইজি ; ১৮৫২-১৯১২)

"বসন্তরাত, বৃথা এ আঁধার চারিধার।
প্লামের মুকুল দৃষ্টি-আড়াল
গন্ধ ঢাকিবে কে তাহার ?"
(মিৎসুনে ; ৯ম শতাব্দী)

চেরীফুল জাপানীদের সবচেয়ে প্রিয়, বসন্তে তাদের চেরী-উৎসব। সেই চেরীফুলের বর্ণনা করেছেন কবি কোরেমিচি (১০৯৩-১১৬৫) :

"পাহাড় চূড়ায় চেরীফুল ফোটে
মেঘের মত,
ঝরে' যায়, যেন গিরিপদমূলে
তুষার শত।"

তেমনি প্রিয় এদের উগুইস্যু পাখীর গান :

"লোকে বলে ঐ বসন্ত দিন আসে,
মন নাহি মানে, উগু'স্যুর গান
যদি না বাতাসে ভাসে।" (কোরেমিচি)

শীতের দিনে গাছে গাছে পাতা ঝরে' যায়, তুষারবর্ষণ চারিদিকে, তীব্র শীতল বায়ু, রিক্ত প্রান্তর, পাণ্ডুর চাঁদ, বর্ষশেষের সুর বাজে কবির কণ্ঠে :

"বসন্ত কবে হেসেছিল হায়
নানিবা-সায়র-তীরে
'সোৎসু'তে, সে যে স্বপন দূর সুদূর !
উত্তর বায়ু আজি শিহরায়
ঝরাপাতা ঘিরে' ঘিরে'
শরবনে তার বাজিছে তীব্র সুর।"
(ভিক্ষু সাইগিয়ো ; ১১১৮-১১৯০)

শরৎসন্ধ্যায় আকাশে আঁকা ছায়াপথ, বনে বনে মেপল পাতার রক্তশোভা, শিশিরের মুক্তাজল আর হরিণদলের সানন্দ বিচরণ! আবার গ্রীষ্মদিনে সেখানে ভোরের অরুণ আলো, সরোবরে পদ্ম-কুমুদের শোভা, গ্রীষ্মের শেষভাগে সুমধুর বৃষ্টি, দিনের শেষে সান্ধ্য বায়ুর স্নিগ্ধ স্পর্শ।

এমনি করে' জাপানের কাব্যলোকে চলেছে প্রকৃতির অফুরন্ত লীলার সুর, জলছবির মত ছোট ছোট কবিতায় ফুটে উঠছে তার অফুরন্ত বর্ণ-বিলাস।

(৩)

শুধু প্রকৃতিই নয়, জীবনের প্রতিদিনকার সুখদুঃখগুলিও ফুটে উঠেছে দু'একটি রেখার টানে, অপূর্ব্ব মধুর হয়ে। সন্তানহারা নারী কবি নাকাৎসুকাসা (১০ম শতাব্দী) লিখেছেন :

"ফুটিবার আগে ক'রেছিনু আশা,
ফুটিলে পরাণ কাঁপি' ওঠে শঙ্কায়,
পাহাড়ের বুকে চেরীফুল ফোটে,
চেরীফুল ঝরে' যায়,
হেরিয়া পরাণ ভরে মোর বেদনায়।"

অজ্ঞাত নারী-কবি তাঁর দরিদ্র স্বামীকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌ছেন :

"ইশামা শিরোর পথে
সবার স্বামী যায় ঘোড়ার 'পরে টগবগিয়ে ছুটে,
আমার স্বামী যায় পায়ে হেঁটে, কত কষ্ট ক'রে
দেখে আমার কান্না পায়।
স্বামী আমার,

এই নাও আমার উজ্জ্বল আয়নাখানি
মায়ের দেওয়া বহুমূল্য এই স্মৃতিচিহ্ন,
আর নাও এই গলবন্ধ রুমাল,
পতঙ্গের মত মেলে দিয়েছে এর ডানা,
এই দিয়ে তুমি কিনে আনো একটি ঘোড়া,
আমার অনুরোধ।"

স্বামীর উত্তর :

"আমি যদি ঘোড়াই কিনি,
তবু ত' তোমায় হবে হেঁটে যেতে,
তার চেয়ে—
যদিও কঠিন বন্ধুর এই পাহাড়ের পথ,
এসো আমরা পাশাপাশি পায়ে হেঁটেই যাই।"

সরল কবিতাগুলিতে জীবনের স্পর্শ আছে : প্রতিদিনকার হাসি অশ্রুতে এরা উজ্জ্বল।

(৪)

জাপানী কাব্যেতিহাসে এসেছে আটটি যুগ। বিস্মৃত পুরাকাল থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত গিয়েছে 'আদিযুগ'। তারপর একে একে 'নারা-যুগ' (৭১০-৭৯৩), 'হেইয়ান-যুগ' (৭৯৪-১১৮৫), 'কামাকুরা-যুগ' (১১৮৬-১৩৩২), 'মুরোমাচি-যুগ' (১৩৩৬-১৫৬৫), 'মানোয়ামা-যুগ' (১৫৬৬-১৬০২), 'ইয়েদো-যুগ' (১৬০৩-১৮৬৭), এবং বর্ত্তমানে চলছে 'তোকিয়ো-যুগ' (১৮৬৮ থেকে)। যুগগুলির নামকরণ হয়েছে বিভিন্ন যুগের রাজধানীর নাম থেকে। সেখান থেকেই ছড়িয়ে পড়েছে সাহিত্য-শিল্প-সভ্যতার ধারা—সারা দেশের দিক্‌দিগন্তে।

প্রথম যুগের কবিদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—সম্রাট নিন্‌তোকু। ইনি ছিলেন উদার-হৃদয়, মহাপ্রাণ এবং সারল্যপ্রিয়। প্রজাদের দারিদ্র্য দেখে তিনবছরের জন্য তিনি তাদের সমস্ত খাজনা মকুব ক'রে দিয়েছিলেন, এবং এত হিসেব ক'রে চলেছিলেন নিজে যে, এই তিন বছরের মধ্যে রাজবাড়ীর কোন সংস্কার করেননি,—যদিও দেয়াল ভেঙে পড়েছে, আর ছাদ গিয়েছে ফেটে। তিনবছর পরে একদিন ছাদে উঠে দেখলেন, বাড়ীবাড়ী রান্নাঘর থেকে ধীরে ধীরে ধোঁয়া উঠছে; আনন্দে তখনই তিনি ব'লে উঠলেন :

"উচ্চ চূড়া হ'তে চাহিনু নীচে,
আকাশ পানে ধূম কুণ্ডলিছে,
প্রজার ঘরে ঘরে সচ্ছলতা,
অন্ন-উৎসব বহে বারতা।"

দ্বিতীয় যুগের প্রধান কবি হিতোমারো। 'শিগা' থেকে এযুগে রাজধানী এসেছিল 'নারায়'। 'শিগা'র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর অতীত রাজধানীর হারানো গৌরব কবির মনকে অভিভূত করেছিল। কবি লিখেছেন :

"ওমি-সায়রের সন্ধ্যা-ঢেউয়ের পরে
উড়িয়া চলেছ মুখর পাখীর দল,
তোমাদের হেরি' অতীতের স্মৃতিমালা
ভরিয়া তুলিছে আমার হৃদয়তল।"

অতীত দিনের রাজধানী আজ পরিত্যক্ত, নির্জ্জন—

"অতীত দিনের রাজধানী হায়,
শিগার তীরে
পড়ি' আছে জনহীন,

তেমনি আজিও চেরীফুল ফোটে
দু'কূল ঘিরে,
আসে বসন্ত-দিন।"

মাঠের পথে কবি বেড়াতে গিয়েছেন ভোর বেলায়।

"মাঠের প্রান্তে উষালোক জাগে
পূব সীমায়,
পিছনে চাহিনু, চন্দ্র তখন
অস্তে যায়।"

পাহাড়ে' নদী দেখতে গিয়েছেন কবি বর্ষার দিনে; মোহন রুদ্র তার রূপ!

"পাহাড়ে নদীর তীব্র স্রোত
গর্জ্জি' ধায়!
য়ুজুকি পাহাড়ে ভীষণ ঘোর
মেঘ ঘনায়।"

প্রিয়ার কথা বহুবার মনে পড়েছে কবির—প্রকৃতির পানে চেয়ে।

"গত বরষের শরতের চাঁদ
এসেছে ফিরে,
সে দিন যে মোর সাথে ছিল, আজ
সুদূর-তীরে।"

অখ্যাতনামা কত কবি রচনা ক'রে গিয়েছেন মনের সহজ আনন্দে। খ্যাতির জন্য নয়; তা'হলে তাঁদের নাম হয়ত' এমন গোপন থাকতনা; নিছক আনন্দের জন্যই লিখে গিয়েছেন তাঁরা।

"শান্ত সন্ধ্যা-ছায়ে সারসের দল
আহারের তরে তীর খুঁজেছিল যারা,

জোয়ারের উচ্ছ্বাসে ভীতি-বিহ্বল
প্রিয়ারে সচকি' তুলি' ডাকিছে তাহারা।"

"শরত-বরষণ গিরির বুকে
নিঠুর জলধারে ঝ'রোনা অনিবার,
রাঙা এ পাতাদল শিহরে সুখে
বৃষ্টিবায়ুঘায় লুটিবে চারিধার।"

'ৎসুরায়ুকি' তৃতীয় যুগের কবি। রাজকার্য্যে তাঁকে বিদেশে থাকতে হ'ত। অবসর পেলে গৃহে ফিরে তিনি প্রকৃতির শোভা উপভোগ করতেন। দীর্ঘকাল পরে পরিত্যক্ত কুটীরে ফিরে তিনি লিখছেন :

"কেহ নাহি আসে কুটীরে আমার,
বসন্ত তবু হাসে
আগাছায় ভরা আমার দুয়ার-পাশে।"

এই যুগের আর একজন কবি 'তাদামিনে' পাহাড়িয়া গ্রামের বর্ণনা করছেন :

"পাহাড়িয়া গ্রামে নিঠুর শরৎ,
হরিণেরা অসহায়,
কাতরকণ্ঠে আমারে জাগায়ে যায়।"

চিত্রণ-নিপুণা মহিলা কবি 'কুনাই-কায়ো' হ্রদের বুকে ঝরা চেরীফুলের সৌন্দর্য্য আঁকছেন একটি কবিতায় :

"হীরা পাহাড়ের বায়ু বহে' আসে
সাগরের বুকে ঝরায়ে ফুল,
সেই ফুল-পথে জল রেখা-আঁকি'
তরী বহে' যায় সুদূর কূল।"

হ্রদের বুকে চাঁদের আলো ; সারা রাত্রি ধরে' নৌকাখানি হ্রদের জলে ব'য়ে চলতে চলতে এখন কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। মহিলা কবি 'তান্‌গো' (দ্বাদশ শতাব্দী) রাত্রির এই রহস্যময় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ।

"সারা রাত ধরি' চলিয়াছে তরী
'কারাসাকি' হ্রদ 'পরে
অদৃশ্য এবে! চন্দ্র এখনো
জ্বলিছে দূরান্তরে।"

'ইয়েদো'যুগে দু'টি প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছে জাপানী কাব্যসাহিত্যে : এক, পৌরাণিক সংস্কৃতি ও রচনারীতিকে অনুসরণ করবার চেষ্টা আর সহজ সরল লৌকিক ভাষাভঙ্গীকে কাব্যে অবতারণা করবার চেষ্টা।

'তোকিও' অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য রোমান্টিক এবং প্রকৃতি-পন্থী কাব্যের প্রভাবও জাপানী সাহিত্যের উপর এসে পড়েছে। কিন্তু অনুকরণের মত্ততায় জাপানী কাব্য তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্য হারিয়ে ফেলেনি।

(৫)

জাপানী কবিতার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকার হচ্ছে হক্‌কু। ৫,৭,৫ —মোট ১৭টি সিলেবল্‌ তার আয়তন। তারই মধ্যে তার রূপের আভাস, ভাবের ব্যঞ্জনা। এত সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যেও কবিতা-গুলির অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনাশক্তি পাঠককে বিস্মিত করে। জীবনের ছোট ছোট ছবি ও ভাব দু'একটি রেখার টানে কি সুমধুর হয়ে ফুটে উঠেছে!

"শরতের পূর্ণ চাঁদ।
পাইন গাছের ছায়া পড়েছে
মাদুরের উপর।" (কিকাকু)

"কি মহান্ দৃশ্য !
সবুজ, তরুণ পাতা—
ভোরের আলোয় ঝল্মল্ !" (বাশো)

এর চেয়ে কিছু বড় ৩১ সিলেব্‌লের 'উতা' বা 'তান্‌কা'। ৫,৭,৫,৭,৭—এই হচ্ছে সিলেব্‌ল্‌গুলির বিন্যাসের রীতি। 'তান্‌কা' জাপানী সাহিত্যে অত্যন্ত প্রচলিত এবং জাপানীদের অতিশয় প্রিয়।

"বসন্ত দিন।
দূর থেকে ভেসে আসে আলো।
তবু কেন আজ ফুলেরা
ঝ'রে যায় বন-প্রান্তে—
অতৃপ্ত হৃদয়ে ?" (তোমোনোরি)

কবিতার নূতন নূতন ভঙ্গীও আজ এসে পড়েছে জাপানী সাহিত্যে। 'হক্কু' আর 'তান্‌কা'র গণ্ডীতেই কবিরা আর কাব্যলক্ষ্মীকে আবদ্ধ রাখতে চাইছেননা। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই কবিতায় রূপবৈচিত্র্য আনবার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষিত হচ্ছে। নবীন কবিরা যে নূতন ধরণের কবিতার প্রবর্ত্তন করেছেন, তার নাম 'শিন্‌তাইশি'। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট মেইজির রাজত্বকালে রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন কয়েক অধ্যাপক তাঁদের নূতন কবিতা এবং পাশ্চাত্ত্য কবিদের রচনার কিছু কিছু অনুবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু নব কবিতা প্রকৃত পক্ষে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও বছর দশেক পরে—'তোসোন শিমাজাকি'র আবির্ভাবের পর। এঁর কবিতায় প্রাকৃতিক চিত্র মনোরম হয়ে ফুটেছে, আর তাতে মাখানো আছে একটি কোমল বিষাদের সুর।

তারপর উল্লেখযোগ্য কবি 'বান্সুই ৎস্থচিয়ি।' হুগো, শিলার প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবিদের প্রভাব এঁর কবিতায় লক্ষিত হয়। 'কিয়ুকিন স্থস্থকিদা'র আদর্শ ছিলেন সৌন্দর্য্য-পূজারী কীট্‌স্‌; তাঁরই মত ইনিও ছিলেন রূপ ও যৌবনের বন্দনাগায়ক। 'আরিয়াকে কান্‌বারা' এবং 'হোমেই ইওআনো' আধুনিক জাপানের আর দু'জন শ্রেষ্ঠ কবি। কান্‌বারার কবিতায় কল্পনার বিস্তার এবং রোমান্টিক স্বপ্নদৃষ্টি আছে।

"একাকী দাঁড়িয়ে শুনি
বিষাদের মৃদু গুঞ্জন;
স্থদূর সমুদ্রের বুকে
অন্তহীন নীলাকাশ
শুভ্র সূর্য্যালোকে
নিত্য যে কথা বলে।

একক সেই বাণী,
শান্ত, তবু সে দীপ্ত;
কি ক'রে জান্‌ব আমি, মৃদুস্বরে কি কথা বলে
স্থদূর সমুদ্র আর আলোকিত আকাশ?" (কান্‌বারা)

ইওআনোর রচনায় আছে বৈচিত্র্য এবং প্রাণের সহজ উচ্ছ্বাস কিন্তু অনেক স্থলেই তাঁর প্রাণের আবেগ শিল্প-সংযমকে উপেক্ষা করেছে, কাজেই কবিতা শিল্প-পরিণতি লাভ করতে পারেনি।

জাপান প্রকৃতিকে ভালবাসে। তার কবিতায় প্রধানতঃ গীত হয়েছে প্রকৃতির স্তবগান। যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্য পরিচালনার অবকাশে সম্রাটেরাও এখানে প্রকৃতির মাধুরী উপভোগ করেছেন। সম্রাট মেইজি (১৮৫২-১৯১২) যুদ্ধান্তে সৈনিকদের বর্ণনা করছেন:

"যোদ্ধা যাহারা—সাগরের বুকে
হঠায়ে দিয়েছে শত্রুর রণতরী,
হয়ত' এখন জলধিবক্ষে
চন্দ্রের শোভা হেরিছে নয়ন ভরি'।"

সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যকে আঁকতে জাপানী কবি সিদ্ধহস্ত। রাত্রির বর্ষণান্তে মুগ্ধ প্রজাপতিদল ফুলের বুকে ঘুমিয়ে আছে। কবি সেই ছবি আঁকছেন :

"কোমল প্রজাপতিদল
ঘুমায়ে কুসুমের বুকে
জানেনা রাত্রির জল,
মুগ্ধ স্বপনের সুখে।"

মুগ্ধ প্রজাপতির ছবি আঁকছেন—আভাসও কি দিয়ে যান নি কবি মুগ্ধ প্রেমিকের ? শুধু ছবি নয়, ছবির মধ্যে দিয়ে ব্যঞ্জনা, জাপানী কবিদের রচনায় সুপ্রচুর।

এই স্বপ্নমুগ্ধ কবির দেশেই নাট্যকারেরা আজ নাটকে রূপ দিচ্ছেন বাস্তব জীবনের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষকে ; আঁকছেন জাপানের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের সুনিপুণ চিত্র। সেখানে জাপানের সাহিত্য-প্রতিভার আর এক অভিনব প্রকাশ, জীবন-সংগ্রামের আঘাত-সংঘাত, আনন্দ-বেদনার কাহিনী। সেখানে আর শরৎ-আকাশের স্বপ্নালস মেঘলীলা নয় ; সমুদ্রতরঙ্গের কল-কল্লোল, জীবন-মৃত্যুর উত্থানপতন।

[পরিচয়, ভাদ্র, ১৩৪৫।]

জীবনের জয়-মুকুট

(একখানি জাপানী নাটক)

আমরা আজ পাশ্চাত্ত্য জগতের সম্বন্ধে যতটা খবর রাখি, প্রাচ্য জগৎ সম্পর্কে ততটা রাখিনা। অথচ, প্রাচ্যদেশগুলির সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ এবং সংস্কৃতিগত, অবস্থাগত এবং আদর্শগত সাম্য রয়েছে।

কথাটা মনে হয়েছিল বিশেষ করে' পার্ল বাকের 'গুড্ আর্থ' পড়তে গিয়ে। বিদেশিনী মহিলা চিনিয়ে দিচ্ছেন আমাদের ঘরের কাছের প্রতিবেশীদের, অথচ আমরা উদাসীন। চীন এবং ভারতবর্ষ বহুদিন থেকে নানা সম্পর্কে যুক্ত, আজও উভয়ের সমস্যা অনেক ক্ষেত্রেই এক, তবু বর্তমানে আমরা কেউ কারও অন্তরঙ্গ নই।

একখানা জাপানী নাটক আর একবার স্মরণ করিয়ে দিল প্রাচ্য জীবন-ধারার অন্তর-গত ঐক্যের কথা। শুধু চীন নয়, জাপানেরও সমাজ-বন্ধনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে।

উপরি-উক্ত নাটকখানির নাম 'জীবনের জয়মুকুট', নাট্যকার ইয়ামামোতো ইয়ুজো। এতে পারিবারিক প্রীতি-বন্ধনের একটি চমৎকার চিত্র ফুটে উঠেছে। দুঃসাহসিক জয়যাত্রার উন্মাদনা নয়, সৌখীন বৈঠকী জীবনের আলাপ আলোচনা নয়, উচ্ছ্বাস-ফেনিল রোমান্স-বিলাসিতা নয়, আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের মধুর, পবিত্র ছবি, স্নেহপ্রেমের গভীর মর্মস্পর্শী কাহিনী। তরুণ-তরুণীর প্রাকৃতিক আকর্ষণ অথবা যৌবন-মোহ আজ আত্যন্তিক মায়াবিস্তার করছে

আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে; ওরই মধ্যে যে জীবনের সমগ্রতা নেই, সেকথা আমরা ভুলে যাচ্ছি। আলোচ্য নাটকে জীবনের অন্যতর ছবি অপূর্ব পরিতৃপ্তি এনে দিল হৃদয়ে। প্রেমের কথা এতেও আছে, অনুদ্বেল দাম্পত্য-প্রেম, একান্নবর্তী পরিবারের নিত্য কর্তব্যের মধ্যে সহজে মিলিয়ে দিয়েছে নিজেকে। উদ্দাম বহ্নিশিখা সে নয়, গৃহ-চ্ছায়ায় স্নিগ্ধ সন্ধ্যাদীপের জ্যোতিঃ।

সমুদ্রতীরে তাঁদের বাড়ী। আরিমুরা ৎসুনেতারো ছিলেন গৃহপতি। তিনি, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ভাই আর বোন, এই নিয়ে তাঁদের সুন্দর ছোট্ট সংসার। টিন ভর্তি করে' মাছ-চালানোর ব্যবসাতে হয় তাঁদের জীবিকার সংস্থান। সভাবে-অভাবে পরস্পরের ভালোবাসায় পরম শান্তিতে কেটে যায় তাঁদের দিন।

এমন সময়ে একটা বড় রকমের অর্ডার পেলেন তাঁরা। দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার টিন বড় বড় কাঁকড়া পাঠাতে হবে ইংলণ্ডে। আরিমুরা জেলেদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলেন, বাছাইকরা কাঁকড়া তারা দেবে।

ভালো লোকেরও শত্রুর অভাব নেই। হিসাতোমি কোম্পানীর কর্মচারী কাতায়ান্গি গোপনে বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল আরিমুরার। ঠিক সময়ের মধ্যে কাঁকড়া জোগাড় হয়ে উঠছেনা। এদিকে শতকরা ত্রিশ টাকা দর চড়ে গেছে সব মাছের এবং কাঁকড়ার।

বাজার চড়া। সকলেই লাভ করবার জন্যে ভালোয়-মন্দয় মিলিয়ে মাছ চালান দিচ্ছে। কর্মচারী এসে জিজ্ঞাসা করল, "বড় কাঁকড়া তো আর মিলছেনা, আমরা যাদের কাছে কিনছি, তারাও ছোট কাঁকড়া মিশিয়ে দিচ্ছে। আমরাও কি সব রকম মিলিয়ে টিন ভর্তি করব?" আরিমুরা অটল কর্তব্যনিষ্ঠ, বিপদের মুহূর্তেও অধর্মের আশ্রয় নিতে রাজী ন'ন।

স্ত্রী মাসাকা বোঝাতে চেষ্টা করলেন, ছোট ভাই কিন্‌জিরো বারবার করে' বললেন, এই দুর্দিনে একটু চালাকি না করলে ঠিক সময়ে মাল জোগান দেওয়া সম্ভব হবেনা। অমনিতেই মাছের দাম চড়ে' যাওয়ায় লোক্‌সান নিশ্চিত ; তার উপর যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ জোগান না দেওয়া যায় তবে বাজারে নাম খারাপ হবে, ভবিষ্যতেও ব্যবসা মাটি হবে। এবার কোনমতে উদ্ধার পাবার জন্যে যেমন করে' হোক, চেষ্টা করা উচিত।

অনুরোধ উপরোধ, মান অভিমান, তিরস্কার ভৎর্সনা সব ব্যর্থ হ'ল। তাঁরা অনেকবার বিরক্তি প্রকাশ করলেন, সর্বনাশের আশঙ্কা জানালেন। আরিমুরা অবিচল।

বন্ধুবেশী শত্রুদের ষড়যন্ত্রে এবং প্রতারণায় আর তাঁর অবিচ্ছিন্ন সাধুতার ফলে সত্যসত্যই আরিমুরাকে সর্বস্বান্ত হ'তে হ'ল। দেনার দায়ে সব বিকিয়ে গেল।

ভোর বেলা। সব হারিয়ে অবসন্ন মনে স্ত্রী আর ভাইবোনকে নিয়ে সমুদ্রতীরে বসে' আরিমুরা ভাবছেন তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা। সততায় অবিচলিত নিষ্ঠা রেখে এতদিন ঝোঁকের বশে আপন পথে চলেছেন। নিয়তি এমন নিষ্ঠুর পরিহাস করবে, তা ভাবতেও পারেন নি। স্ত্রী আর ভাই কত অনুরোধ করেছিল, অনুযোগ দিয়েছিল, কারও কথা তিনি শোনেননি, আপন জেদের বশবর্তী হয়ে তিনি তাদেরও নিরাশ্রয় করেছেন, পথে টেনে এনেছেন। আজ কি বলবার আছে তাঁর, কি সান্ত্বনা দেবেন নিজেকে ? সবাই যত খুশি তিরস্কার করুক, সব তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য। অনুশোচনায় মন উদ্বেল হয়ে উঠছে।

অপরাধীর মত মৃদুকণ্ঠে সসঙ্কোচে বললেন : তোমরাই ঠিক বলেছিলে। আমি মূর্খ, তোমাদের কথা শুনিনি। তাই আজ সব হারিয়ে পথে বসেছি, তোমাদেরও পথে বসিয়েছি।

ছোট ভাই সান্ত্বনা দিলেন: না, দাদা, তোমার দোষ কি? বাজার খারাপ হওয়াতেই তো আমাদের এই সর্বনাশ হ'ল। আর যাদের অর্ডার নিয়েছিলাম, তাদের ঠকিয়ে কি মঙ্গল হ'ত আমাদের?

স্ত্রী বললেন: দু'দিন না-হয় কষ্টই ক'রব আমরা, সবাই মিলে ভাগ ক'রে নেব এই দুঃখ। লোভে প'ড়ে ধর্ম হারাইনি, এ আশ্বাস তো আমাদের থাকবে।

দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনায় যারা একসঙ্গে একদিন ভৎর্সনা করেছিল, আজ দুঃখের দিনে তারাই দিচ্ছে সান্ত্বনা, দিচ্ছে সাহস, স্নেহপ্রীতির সুধায় জুড়িয়ে দিচ্ছে মনের তাপ। পারিবারিক জীবনের এমন মধুর সম্প্রীতির চিত্র বেশী কি আছে আমাদের এ যুগের সাহিত্যে? এই দৃঢ়বদ্ধ গার্হস্থ্যজীবন—এ কি প্রাচ্যসমাজের বৈশিষ্ট্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়না?

ইয়ামামোতো ইয়ুজো আধুনিক নাট্যকার, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। নাট্যরচনায় কৃতিত্ব তাঁর অসাধারণ। আধুনিক জাপানের নানা সমস্যা এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা তাঁর বিভিন্ন নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সমস্যা বা আদর্শ জীবন-নিরপেক্ষ হয়ে দেখা দেয়নি, সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল সজীব মানব-হৃদয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাঁর লেখনীর মায়াস্পর্শে। মনে হয়, এ যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের পার্শ্বেই তাঁর স্থান। অথচ, আমরা তাঁকে কত কম জানি!

[মন্দিরা, শ্রাবণ, ১৩৪৮]

শাংহাইয়ে ঝড়

(আন্দ্রে মল্‌রো।)

'শাংহাইয়ে ঝড়'—নাম দেখে কৌতূহল জাগল। মোড়কের লেখা থেকে জানা গেল, মূল ফরাসীতে বইখানির নাম ছিল 'মানব-ভাগ্য,' আর এই উপন্যাসের জন্য গ্রন্থকার গঁকুর-পুরস্কার পেয়েছিলেন।

ভাবলাম, পড়ে দেখি। নবযুগের নবরীতির ঐতিহাসিক উপন্যাস। বন্দিনী রাজকন্যা নেই, প্রণয়ী রাজকুমার নেই, অতীত-স্বপ্নের মায়াদীপ্তি নেই, জীবনসংগ্রাম-জর্জরিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট আধুনিক মানুষের কাহিনী, তাদের দুঃখ-দুর্দশা বাসনা-বেদনার ইতিহাস কিন্তু কম মনোজ্ঞ নয়। এক বিরাট্ জাতির হৃদয়-স্পন্দন আমাদের হৃদয়ে এসে পৌঁছয়, বহু নরনারীর সুখ-দুঃখের আলোড়নে অন্তর আকুল হয়ে ওঠে।

শাংহাই চীনের শহর হয়েও চীনাদের হাতছাড়া। পাশ্চাত্ত্য বণিকের দল বাণিজ্যসূত্রে এই শহরে এসে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় অধিকার হস্তগত করে। চীনের সাম্যবাদী যুবকদল মুক্তিকামনায় অধীর হয়ে কি ক'রে আত্মাহুতি দিয়েছিল, তারই উজ্জ্বল চিত্র গ্রন্থকার দৃঢ়হস্তে এঁকেছেন।

"১৯২৭—২১শে মার্চ। রাত্রি সাড়ে বারোটা। চেন্ কি মশারিটা তুলে ফেলবে? না, ওর মধ্যে দিয়েই ছোরা চালিয়ে দেবে? কেউ দেখে ফেলছেনা তো তাকে? সাম্‌নাসাম্‌নি যদি যুদ্ধ হ'ত,

সজাগ সতর্ক শত্রু যদি আঘাতের বদলে আঘাত ফিরিয়ে দিত,—কত স্বস্তি বোধ করত সে !

বাইরের কোলাহলের ঢেউ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। বোধ হয়, অনেকগুলি গাড়ি এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল।

·········এই লোকটির মৃত্যু চাই। সে ধরা পড়বে কিনা, খুনের দায়ে শাস্তি পাবে কিনা, সে চিন্তা এখন নয়। এখন শুধু একটি ভাবনা। এক আঘাতে শেষ ক'রে দিতে হবে সামনের লোকটিকে। যেন বাধা দেবার অবকাশ না পায়। বাধা দিতে পারলেই তো চেঁচিয়ে উঠবে।"

এই 'চেন্'—বিপ্লবী, আততায়ী চেন্। অথচ বিপ্লবী দলের সকলের থেকে তার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। আত্মবলি দিতে সে উন্মুখ, কারণ, সাধারণের প্রার্থিত সাংসারিক জীবন, এর সুখ-সম্ভোগ-আরাম তার কাছে অর্থহীন।

চেনের বন্ধু 'কাইয়ো' একই পথের পথিক, একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক। তার পিতা গিসর্স্ ছিলেন শিক্ষক—চেনেরও শিক্ষক। যৌবনে গণ-জাগরণের প্রতি ছিল তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ, ছাত্রেরা তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছে। বার্ধক্যে আফিমের মৌতাত আর দার্শনিক ঔদাসীন্য হয়েছে তাঁর আশ্রয়। অথচ, এই উদাসীনতার অন্তরালে আত্মগোপন ক'রে আছে একটি পরম কোমল স্নেহশীল হৃদয়। প্রিয় ছাত্র চেনের জন্য উৎকণ্ঠা, কাইয়োর প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল চেষ্টা—তাঁর নিভৃত অন্তরের পরিচয় বহন করছে। স্নেহবান্ তিনি, কিন্তু কাপুরুষ ন'ন, পুত্রকে তার ঈপ্সিত পথ থেকে ফেরাবার চেষ্টা করেননি কখনও।

চীনের আধুনিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের অনেক কথা স্থান পেয়েছে এতে। বিদেশী বণিকদের কার্যকলাপ, যুদ্ধনায়কদের হানাহানি,

চিয়াংকাইশেকের হত্যার আয়োজন, কম্যুনিষ্ট বিপ্লব, সবই এতে আছে, কিন্তু কেবল ঘটনা বর্ণনাই লেখকের উদ্দেশ্য নয়, ঘটনার অন্তরে প্রবেশ করতে চেয়েছেন তিনি। ঘটনার পটভূমিতে তিনি জীবনের রূপ উন্মোচিত করেছেন।

ফরাসী রাষ্ট্রযন্ত্রে শিল্পপতিদের প্রভাব কতখানি, এবং চীনের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পাশ্চাত্ত্য বণিকদের প্রভুত্ব কি ভাবে চলছে, শাংহাইয়ের ফরাসী বণিক্‌সমিতির সভাপতি ফেরালের চরিত্রবর্ণনা উপলক্ষ্যে গ্রন্থকার তা দেখিয়েছেন। কিন্তু ফেরালকেও তিনি কেবল একটি ভাবের প্রতীকরূপে উপস্থিত করেননি, কামনা-বাসনায় গড়া মানুষ ক'রেই এঁকেছেন।

এই মানবতার স্বাদ আছে ব'লেই বইখানি এমন মনোরম হ'য়েছে। আমরা কেবল তথ্যকণ্টকিত বিবরণ পড়িনা, সজীব মানব-হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করি, বিচিত্র নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে জীবন-সমুদ্রের কলকল্লোল শুনতে পাই।

হেমেলরিচ গরীব চাকুরে, দুঃখে কষ্টে দিন চালায়, কম্যুনিজ্‌মে বিশ্বাসী, ক্যাইয়োর এবং চেনের বন্ধু। রুগ্ন মরণাপন্ন স্ত্রীপুত্রের বিপদাশঙ্কায় সে বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখতে অস্বীকার ক'র্‌ল। চোখে তার জল। বন্ধুদের প্রতি, আপন আদর্শের প্রতি সে বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রেছে, অনুতাপে হৃদয় জর্জ্জরিত, অথচ স্নেহে প্রেমে মন দুর্বল। জীবনের এমনি অনেক ছোট ছোট ছবি গ্রন্থমধ্যে ফুটে উঠেছে।

চীনের জাতীয় জীবন আজ দুর্যোগের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। তাই তার কাহিনী এমন নির্মম বেদনাময়। শাংহাইয়ের ঝড় শুধু শাংহাইয়ের নয়, সারা চীনের উপর দিয়ে সে ঝড় ব'য়ে চলেছে, সারা পৃথিবী জুড়ে তার মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। এই ঝড়ের মুখে মানুষগুলি

ঝরাপাতার মত উড়ে যায়। নিয়তির অমোঘ ইঙ্গিত। বিপ্লবীদের ব্যর্থতায় এবং আত্মোৎসর্গে উপন্যাসের অবসান। কিন্তু মৃত্যুর উপরেও উড়ছে তাদের জয়ের নিশান। তা'রা জীবন দিয়ে গেছে, মনের স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়ে গেছে দেশের মাটিতে, সেখানে জাগছে অঙ্কুর, হয়তো কোন দিন ফুটবে ফুল, ফলবে ফল।

গ্রন্থের নায়ক কাইয়োর বলিষ্ঠ পৌরুষ স্মৃতির পটে আঁকা থাকবে চিরদিন। 'বাস্তব পন্থা' বলতে যা বোঝায়, এ উপন্যাসে তা'র লক্ষণ পরিস্ফুট। মানুষের দোষক্রটি দুর্বলতার কথা এতে অসংকোচে বলা হয়েছে। কিন্তু সেগুলিকেই সর্বস্ব ক'রে তোলা হয়নি। দুর্বল মনের বীভৎস দুঃস্বপ্ন নেই, শুধু সরল স্বাভাবিকতা আছে। কাইয়োর হৃদয়েও কামনা জাগে, কিন্তু সে কামনার ক্রীতদাস নয়। প্রিয়া 'মে' তা'কে ডাকে, বিপ্লবের কাজে সঙ্গে যেতে চায়। কাইয়ো দেখে— স্ত্রীর চোখে অশ্রু, শোনে—কণ্ঠে তার করুণ মিনতি, কিন্তু মরণের আহ্বান সর্বজয়ী ; নির্মম হস্তে তাই ছিন্ন কর'তে হয় সব আসক্তির বন্ধন, ফেলে যেতে হয় সংসারের সকল কাম্য বস্তু।

কাইয়োর মৃত্যু হ'ল। কবরে পাঠাবার আগে মে সযত্নে তার চুল আঁচড়িয়ে দিল, মুখের পানে তাকিয়ে রইল, মনে মনে ব'লল : "প্রিয় আমার!" চীৎকার ক'রে কাঁদলনা। শোকাবেগ হৃদয়ে রুদ্ধ ক'রে বেদনার প্রতিমার মত' শান্ত হ'য়ে গেল।

কিছুদিন পরে যাত্রার উদ্‌যোগ ক'রতে ক'রতে মে তা'র শ্বশুর গিসর্‌সকে ব'লল : "চিঠি পেয়েছিলে, বাবা?" "হাঁ।" "তবে চল, বেরিয়ে পড়ি। এক্ষুণি যে রওনা হ'তে হবে। সময় নেই।" "আমি যাবনা, মা।" খানিকক্ষণ থেমে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : "তুমি এখন কোথায় যেতে চাও? কি ক'রবে সেখানে গিয়ে?"

"আমি মস্কৌয়ে যা'ব। সেখানে বিপ্লবী নারীকর্মীদের মধ্যে আমি কাজ ক'রতে চাই।" খানিকক্ষণ থেমে,—"কাইয়োর মৃত্যুর প্রতিশোধের পথ হয়তো সেখানেই মিলবে।"

"প্রতিশোধ নেবার মতন বয়স আমার আর নেই, মা।

"তবে তুমি এখানে কি ক'রবে, বাবা?"

"আমি এখানে পাশ্চাত্য চিত্রকলার অধ্যাপকের পদ পেয়েছি। আবার আমার পুরোনো কাজে ফিরে যা'ব।"

"তুমিই না ব'লতে বাবা, এবার জাতির ত্রিশ শতাব্দীর ঘুম ভেঙেছে, আর সে ঘুমোবেনা?"

"হাঁ। এখনও সে কথা আমি ভুলিনি। কিন্তু বিপ্লবের আগুন আমার মধ্যে নিবে গেছে। সংসারের প্রতি আকর্ষণ কোন দিনই আমার মধ্যে প্রবল ছিল না। কাইয়োর জন্যেই মানুষের সঙ্গে আমার সংযোগ। সে মরে' গিয়ে আমায় সকল বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে। একই সঙ্গে জীবন এবং মৃত্যু—দু'য়েরই হাত থেকে আমি মুক্ত।"

চুরুট ফেলে দিয়ে বৃদ্ধ ব'ললেন: "জীবনের সঙ্গে বেশীদিন ছলনা চলেনা। বাস্তব সত্য কোথাও নেই, আছে শুধু ভাবের জগৎ। সে জগতে প্রবেশ ক'রলে বোঝা যায় সবই মায়া, সবই অর্থহীন।"

মে'র মনে প'ড়ল, কাইয়ো একদিন ব'লেছিল: "আফিমের প্রভাব বাবার জীবনে বড় প্রবল। এক এক সময়ে ভাবি, আফিমের ঘোরে তাঁর জীবন চ'লছে, না—আফিম কতকগুলি রুদ্ধ শক্তিকে প্রকাশ করতে চাইছে—যার জন্যে তাঁর ব্যাকুলতা।"

গিসর্স্ ব'লতে লাগলেন: "চেন্ বেঁচে থাকলে দেখতে, সে সব খুনের কথা ভুলে যেত। হাঁ,—সব ভুলে যেত।"

"কিন্তু আর সবাই তো ভোলেনি। তাঁর মৃত্যুর পর দু' দু'বার বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটেছে। আমার তো মনে হয় বিপ্লবের পর চেন্ আর এক বছরও বাঁচতেন না। জগতে এমন কোন মহিমা নেই যা বেদনার উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়।"

বেদনার পথে যে শুনেছে তা'র জীবনের আহ্বান। তাই সংসার তা'র কাছে শূন্য হ'য়ে গেছে। গিসর্স্ সস্নেহ চুম্বনে তা'কে বিদায় দিলেন। কাইয়ো এম্নি করে'ই চুম্বন রেখে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল, আর ফেরেনি। "আর এখন কাঁদিনা আমি।"—ব্যথাভরা অভিমানে সে একবার ভাব্‌ল।

* * *

সংগ্রাম-রত কয়েকটি জীবনের ত্যাগদীপ্ত চিত্র পরম অনুকম্পার সঙ্গে এঁকেছেন এই ফরাসী কথাশিল্পী। সহজ সত্যকে তিনি মনোরম ক'রে বর্ণনা ক'রেছেন। মানুষকে যাঁ'রা মানুষ-ভাবে দেখতে চান এবং নিপীড়িত মানবাত্মার বিজয় অভিযানে আনন্দ বোধ করেন, তাঁ'দের কাছে এ গ্রন্থ উপাদেয় ব'লে গণ্য হ'বে।

[মন্দিরা, আশ্বিন, ১৩৪৮]

অ্যাণ্টন চেখভ্

টলস্টয়-ডস্টয়েভ্স্কির যুগ এবং আধুনিক কালের সূচনা, উভয়ের সন্ধিক্ষণে অ্যাণ্টন চেখভের আবির্ভাব।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি, দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতামহ ছিলেন কৃষক, পিতা পাভেল তাগান্‌রোগ-শহরে কেরাণীর কাজ করতেন।

চেখভের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় তাঁর কুড়ি বছর বয়সে। তিনি তখন ডাক্তারি পড়েন। ডাক্তারি সাহিত্যিকের উপযোগী পেশা কিনা, সন্দেহ হ'তে পারে। কিন্তু আধুনিক কালে আরও সাহিত্যিক ডাক্তারের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি, যথা—ইংরেজী সাহিত্যে ডাক্তার ক্রোনিন, এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহযোগিতাও লক্ষ্য করেছি। চেখভ্ নিজে বলেছেন: "ডাক্তারি-শিক্ষার প্রভাব আমার সাহিত্যের উপর প'ড়েছে। এই শিক্ষা আমার দৃষ্টিকে প্রসারিত ক'রেছে, জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছে।......... বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হ'য়েছি ব'লেই বৈজ্ঞানিক রীতির দিকে আমি লক্ষ্য রেখেছি এবং যথাসম্ভব বিজ্ঞানের তথ্যগুলিকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছি। যে-সব কথা-সাহিত্যিক বিজ্ঞানের প্রতি বিমুখ, আমি তাঁদের দলে নই। যাঁ'রা কেবলমাত্র নিজের বুদ্ধি বা কল্পনা দিয়ে সব জিনিষকে দেখেন, তাঁদের দলভুক্তও আমি নই।

ধনতান্ত্রিক যুগের অবসান-কালে রুশদেশে জীবনের যে অপচয় ও ব্যর্থতা দেখা দিয়েছিল, তা'র অনেক করুণ ছবি ফুটেছে চেখভের গল্পে। সে ছবি বিদ্রোহের আগুন-রঙে আঁকা নয়, গভীর বেদনার

ছায়া-ঘেরা; দেখেই মনে হয়, সূক্ষ্ম সুকুমার একটি মন চারিদিকের স্থূলতায় পীড়িত। সমাজের শতশত অসঙ্গতি তাকে প্রতিক্ষণে ব্যথিত ক'রে তোলে, কিন্তু সে নিরুপায়।

হাসি-অশ্রু-রঙীন সংসারের বিচিত্র রূপ অতি সহজ সুন্দর হ'য়ে দেখা দিয়েছে তাঁর গল্পে। কোথাও আড়ষ্টতা নেই, কষ্টকল্পনা নেই, তথা-কথিত বাস্তবতার রূঢ় বিচার-বিশ্লেষণও নেই। সামাজিক দোষ-ত্রুটি নিয়ে পরিহাস আছে, সে পরিহাস নিষ্ঠুর নয়। আর আছে দুঃখীদের প্রতি প্রগাঢ় অনুকম্পা। 'স্কুল-মাষ্টার' গল্পে শিক্ষকের আচরণ যতই হাস্যকর হোক, লেখকের সমবেদনা তাঁ'র উপর পূর্ণ মাত্রায় বর্ষিত। 'আদরিণী' ('ডার্লিং') সমাজ-নীতির অনুবর্তন নাই করুক, তা'র সরল সুন্দর হৃদয়টি শিল্পীর নিকট সমাদৃত।

পৃথিবীকে, মানুষকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। তাই তাঁর রচনায় পরুষতা নেই, আছে স্নিগ্ধ সরসতা। সকল শ্রেণীর মানুষকেই তিনি হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা ক'রেছেন। এ কালের অনেক লেখক দুঃখ-বেদনার ছবি এঁকেছেন তিক্ত মন নিয়ে, শিল্প-সঙ্গতি রক্ষা ক'রে চলেননি তাঁদের লেখায়। চেখভ তেমন ন'ন। জীবনে দুঃখ পেয়েছেন বিস্তর, তার স্পর্শও লেগেছে তাঁ'র লেখায়, কিন্তু শিল্প-সুষমা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। রোগক্লান্ত যন্ত্রণাক্লিষ্ট এ শিল্পী কেমন ক'রে এমন মেজাজ ঠিক রেখেছেন, ভেবে পাইনা। যে গল্পটি পড়ি, মনে হয়, নিখুঁত সৃষ্টি। গোর্কি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন: "একদিন টল্‌স্‌টয় চেখভের একটি গল্পের—বোধ হয়, 'দুশেন্‌কা'র প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিলেন; বলেছিলেন, ঠিক যেন কোন পুণ্যবতী কুমারীর হাতে-বোনা লেস্। এমন লেস্ বুনতে জান্‌ত শুধু প্রাচীনকালের লোকেরা। এমন লেস্-বুনিয়ে ছিল শুধু প্রাচীনকালে।

তা'রা লেসের নক্‌শাতে তা'দের সকল সুখের স্বপ্ন, সমগ্র জীবন ফুটিয়ে তুলত। যা' কিছু তা'দের প্রিয়, তার স্বপ্ন বুনে যেত ঐ নক্‌শায়, বুনে যেত তা'দের আশঙ্কা-চঞ্চল পবিত্র ভালোবাসার ছবি।"

একখানি চিঠিতে গোর্কি চেখভ্‌কে লিখেছিলেন: "বাস্তববাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, নিঃসন্দেহ। আপনাকে অতিক্রম ক'রে যাবার ক্ষমতা আর কারও নেই। সহজ কথাগুলো আপনার মত সহজ সুন্দর ক'রে আর কেউ লিখতে পারেন না। আপনার সামান্য কোন গল্পও যখন পড়ি, মনে হয়, ওর তুলনায় অন্য সকলের রচনা স্থূল, যেন মুগুর দিয়ে লেখা, কলম দিয়ে নয়।"

মোপাসাঁকে আমরা ছোটগল্পের রাজা বলি। কিন্তু শিল্প-নৈপুণ্যে, বিষয়বৈচিত্র্যে, ভাব-চিত্রণে সম্ভবতঃ চেখভ্‌ মোপাসাঁর চেয়ে নিকৃষ্ট ন'ন। মানবের প্রতি অনুকম্পায়, জীবনের প্রতি সহজ প্রেমে বোধ হয় তাঁর রচনা গভীরতর, সমৃদ্ধতর। টল্‌স্টয় বা ডস্টয়েভ্‌স্কির কল্পনার বিশালতা তাঁর ছিলনা সত্য, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ-বেদনার এমন শক্তিমান শিল্পী পৃথিবীর সাহিত্যে বেশী দেখা দেননি, একথা নিশ্চিত।

কবি হালি

(১৮৩৭-১৯১৪)

উর্দু সাহিত্যে কবি হালির অক্ষয় নাম। কিন্তু আমরা অনেকেই তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ রাখিনা। আজকের সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের দিনে তাঁর কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ, তিনি ছিলেন জাতীয়তার কবি, 'অখণ্ড ভারতের' সেবক।

এই প্রসঙ্গে মনে হয়, ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান সম্ভবতঃ সাম্প্রদায়িক মিলনে সাহায্য ক'রতে পারে। আজ যে আমরা পরস্পরের সঙ্গে কিছুতেই মিলতে পারছিনা, তা'র প্রধান কারণ আমাদের আন্তরিক অপরিচয় এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা।

অথচ এক কালে আমাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান স্বচ্ছন্দভাবে চ'লত। আজ বাইরে আমাদের মেলামেশার সুযোগ বেড়েছে, কিন্তু অন্তরে যেন আমরা ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়ছি।

* * *

কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্বে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীনপন্থী এক মুসলমান পরিবারে কবি হালির জন্ম হয়। ছেলেবেলায় তিনি সনাতন রীতির দেশী শিক্ষাই পেয়েছিলেন; পরে বড় হ'য়ে ইংরেজী ভাষার চর্চা করেন এবং আধুনিক ভাব-জগতের সঙ্গে পরিচিত হ'ন। কর্মজীবনে প্রবেশ ক'রে কিছুকাল তিনি দিল্লীতে ইঙ্গ-আরবীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এই সময়েই তাঁ'র কবি-কীর্তি লোকসমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিজাম-বাহাদুরের কাছ থেকে তিনি

মাসিক ৭৫৲ বৃত্তি লাভ করেন। পরে এই বৃত্তির পরিমাণ বর্ধিত হ'য়ে ১০০৲ টাকায় দাঁড়িয়েছিল। ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁ'র যে-সকল রচনা প্রকাশিত হ'য়েছিল তা'তে ঘালিব ও শাইক্‌তার প্রভাব লক্ষিত হয়। উর্দু ভাষায় তিনি অনেক গজ্‌ল্‌ রচনা ক'রে গিয়েছেন। 'দিওআন্‌' তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ। এতে কবি প্রেম-বিলাসী. রূপমুগ্ধ. ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল তাঁর কল্পনাকে আচ্ছন্ন ক'রেছে। 'শের বা শাইরি' নামক গদ্যগ্রন্থে তিনি কবিতার সমালোচক। 'বরখরুত' ঋতুলীলার কাব্য, টম্‌সনের 'সীজ্‌ন্‌স্‌' এবং কালিদাসের 'ঋতুসংহার'এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'নিশাত্‌-ই-উমিদ্‌' আশার জয়গান। 'হুব্‌বি ওআতান্‌'-এ প্রবাসীর হৃদয়-বেদনা এবং কবির দেশানুরাগ সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। স্বদেশের উদ্দেশে কবি বলছেন:

"স্বর্গ পেলেও চাইনা আমি একমুঠো তোর ধূলির বিনিময়ে।"

ভারতকেই তিনি তাঁ'র স্বদেশ ব'লে জানতেন এবং তা'রই বন্দনা গেয়েছেন বহু কবিতায়। ভারতের আদিম অধিবাসীদের দেশপ্রীতি তাঁ'র কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ ক'রেছিল। আর্যদের হাতে পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হ'য়েছে তা'রা, কিন্তু দেশের মাটি ছাড়েনি। শত দুঃখেও তা'রা দেশের ধূলি আঁকড়ে প'ড়ে র'য়েছে।

"কাহারেও তুমি ভাবিও না পর হিন্দু মুসলমান
ব্রাহ্ম বৌদ্ধ যে-ই হোক সে যে স্বদেশেরই সন্তান।
প্রীতির নয়ানে চাহ সবা-পানে, তাহারা নয়নমণি,
স্বদেশের শুভ চাহ যদি, লহ সবারে আপনা গণি'।"

জাতি অসাড়, নিদ্রিত। উদ্দীপন-মন্ত্রে আহ্বান ক'রেছেন কবি:

"ভাঙো অবসাদ, জেগে ওঠো সবে;
নিন্দায় অপমানে
ঘুমায়েছ বহুদিন।

উঠাও, জাগাও, বাঁচিতে শিখাও
সবারে সসম্মানে—
কলঙ্ক গ্লানিহীন।”

ভারতের অনৈক্য ও গৃহবিচ্ছেদই তা'র দুর্গতির প্রধান কারণ। কবিকে পীড়িত ক'রেছে তা'র এই শোচনীয় হীনতা।

“জগৎ জুড়ে এমন জাতি মিলবে না-কো কোন' দেশে
ভাই যেথানে ভাইকে রুখে দাঁড়ায় এসে শত্রু বেশে।
আপন হ'য়ে পরের মতন যা'রা কেবল বিবাদ করে,
প্রাণের দাবি নাই তাহাদের, মৃত্যু ভালো তা'দের তরে।”

আত্মকলহ জাতির ধ্বংসের পথ, বারবার সে কথা তিনি তাঁর দেশ-বাসীকে শুনিয়েছেন। আমরা কেউবা শুনেছি, কেউবা শুনিনি। 'মুসাদ্দা' রচনায় তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। 'মদ্দ্‌রা-জাজব্‌-ই-ইস্‌লাম' বা 'ইস্‌লামের উত্থান-পতন' গ্রন্থে তিনি ইস্‌লামের বর্তমান অবনতির জন্য দুঃখ প্রকাশ ক'রেছেন এবং অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন জাগাতে চেয়েছেন। তাঁ'র শেষ জীবনের রচনায় ইস্‌লামের কথাই প্রাধান্য লাভ ক'রেছে, কিন্তু তা'তে সংকীর্ণতা বা ভেদনীতির সমর্থন নেই।

উর্দু সাহিত্যে তাঁ'র স্থান অনন্যসাধারণ। তাঁ'র গজ্‌ল্‌ এবং মুসাদ্দা উর্দু সাহিত্যের পরম সম্পদ্‌। প্রকৃতি-প্রীতি এবং মানব-প্রেমের রসে তাঁ'র কাব্য স্নিগ্ধ। উর্দু সাহিত্যে তিনিই এনেছিলেন নবযুগের বাণী। গতানুগতিক রীতি থেকে উর্দু কবিতাকে তিনি মুক্তি দিয়ে গিয়েছেন। ইক্‌বাল-প্রমুখ পরবর্তী শক্তিশালী কবিদের তিনি পথপ্রদর্শক। জাতীয়তার উদ্বোধক ব'লেও তিনি স্মরণীয়।

স্বার্থরচিত সংকীর্ণ প্রাচীর ভেঙে দিয়ে জাতীয়তার রাজপথে বাহির হ'তে আহ্বান ক'রেছিলেন তিনি। তাঁ'র মৃত্যুর বহু বৎসর পরেও আমরা সে আহ্বানে সাড়া দিইনি।

* * *

জাতীয় প্রগতির অভিলাষী যাঁরা, তাঁদের কর্তব্য ভাব-নায়ক-গণের সঙ্গে জাতির পরিচয় করিয়ে দেওয়া। প্রদেশে-প্রদেশে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে ভাব-গত যোগ সাধন করতে পারলে অন্ধ বিদ্বেষের তীব্রতা হয়তো উপশমিত হবে। বাঙালী লেখকগণের এ বিষয়ে দায়িত্ব আছে। বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতীয় ভাবধারাকে প্রবাহিত ক'রে দেওয়া তাঁ'দের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। বাঙালী মুসলমান লেখক-সম্প্রদায় যদি আরবী, ফারসী এবং উর্দ্দু'র উন্নত ভাবসমূহকে সর্বসাধারণের উপযোগী ক'রে বাংলাভাষার মারফতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন, তা' হ'লে তাঁ'দের স্ব-সম্প্রদায়ের এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে।*

[প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪৯।]

---

* উদ্ধৃত কবিতাংশগুলি প্রবন্ধকার-কর্তৃক অনূদিত

কবি ইক্‌বাল

ভারতীয় ঐক্যকে আমাদের জাতীয় জীবনে সত্য ক'রে তুলতে গেলে পরস্পরকে জানবার ও চেনবার ঐকান্তিক সাধনা আবশ্যক। ভারতবর্ষ আজও অধিকাংশের কাছে একটি নাম মাত্র, এর বিচিত্র জীবন-ধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় অতি সামান্য। এককালে ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম জুড়ে যে একটি অখণ্ড সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছিল, তা'কে আজ আমরা প্রায় হারিয়ে ফেলেছি। এদিকে নবনব ধারা বাইরে থেকে এসে পড়েছে, তাদের কি ক'রে মিলিয়ে নেব, এখনও স্থির ক'রে উঠতে পারিনি।

এর কারণ যা-ই হোক, একথা সত্য যে আমাদের মধ্যে ভাবগত যোগ প্রতিষ্ঠা ক'রতে না পারলে ঐক্য কেবল কথার কথা হ'বে মাত্র। মনের মধ্যে যখন সান্নিধ্য এবং সাদৃশ্য উপলব্ধি ক'রতে পা'রব, তখনই একতা-বন্ধন দৃঢ় ও সার্থক হ'য়ে উঠবে। বাইরের জোড়াতাড়ায় প্রকৃত মিলন প্রতিষ্ঠিত হবে না।

কবি ইক্‌বালকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ থেকে আমরা অনেকে বঞ্চিত, তা'র কারণ, তিনি লিখে গিয়েছেন উর্দুতে এবং ফার্সিতে; উভয় ভাষাই বাঙালী জনসাধারণের, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুর অপরিচিত।

ভারতের ভাষাবৈচিত্র্য তা'র ভাবগত মিলনের এক প্রধান অন্তরায়। তথাপি যদি দু'চার জন জ্ঞানী গুণী আপন প্রাদেশিক ভাষার গণ্ডী পার হ'য়ে অন্যান্য প্রদেশের রত্ন আহরণ ক'রে নিজ ভাষাকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলেন তবে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হয়। এবিষয়ে কেউ

চেষ্টা করেননি, এমন নয়, কিন্তু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সুনিয়মিত চেষ্টা এখনও চোখে পড়েনি। এটা দুর্ভাগ্য।

কবি ইক্‌বালের কথাই ধরা যা'ক। তিনি ভারতবর্ষের গৌরব, অথচ তাঁ'কে সমগ্র ভারতের কাছে পরিচিত করবার চেষ্টা কোথায়? তাঁ'র রচনার ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে, কিন্তু ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষায় তাঁর গ্রন্থাবলীর অনুবাদ নেই।

বর্তমানে বাংলার মুসলমান সমাজে উত্থান-চেষ্টা দেখা দিয়েছে। বাঙালী মুসলমান সমাজ সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে চাইছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও সে তা'র বিশিষ্ট আসন দাবি ক'রছে। ইস্‌লাম সংস্কৃতিকে বাংলাভাষায় সুষ্ঠুরূপ দেওয়া বোধহয় তার অন্যতম কর্তব্য।

দু'একজন মুসলমান সাহিত্যসাধক সুমধুর বঙ্গভাষায় আরব-পারস্যের কীর্তিকাহিনী প্রচার ক'রেছেন। তাঁদের সে রচনা বাংলা-ভাষার সম্পদ্‌। তাঁ'রা শুধু যে বঙ্গভাষার একটা অভাব পূরণ ক'রেছেন তাই নয়, তাঁরা আরব-পারস্যের বিচিত্র গৌরবের প্রতি বাঙালী সমাজের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রেছেন।

উর্দু এবং ফার্সি-জানা বাঙালীর অবশ্য কর্তব্য বাংলাভাষায় ইক্‌বালের রচনাবলীর অনুবাদ প্রকাশ করা এবং তাঁ'র সাহিত্য ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা।

১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবের এই সুবিখ্যাত কবি শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, তাঁ'র পূর্বপুরুষ এককালে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ছিলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্‌. এ. পাস ক'রে কবি ইক্‌বাল কিছুদিন লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজে এবং পরে তথাকার সরকারী কলেজে ইতিহাস, দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। পরে তিনি বিলাত যাত্রা করেন এবং কেম্‌ব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে উপাধি লাভ করেন। একটি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা ক'রে তিনি জার্মেনির মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্‌টর উপাধি পা'ন। তৎপর পুনরায় ইংলণ্ডে গিয়ে ব্যারিস্টারী পাস করেন। কিছুদিন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষার অধ্যাপনা ক'রে দেশে ফিরে তিনি লাহোরে ব্যারিস্টারি ক'রতে থাকেন। বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি দেশে বিদেশে সর্বত্র সমাদর লাভ ক'রেছিলেন। মুসলমান সমাজে তিনি সম্মানিত নেতার আসন লাভ ক'রেছিলেন, হিন্দুসমাজেও চিন্তাশীল ও কবি ব'লে শ্রদ্ধা অর্জন ক'রেছিলেন। উর্দু-ভাষায় তিনি অনেক সুন্দর কবিতা ও গান রচনা ক'রে গিয়েছেন। অনেক কবিতাই ধর্মবিষয়ক অথবা দার্শনিকভাবাপন্ন। তাঁ'র অধিকাংশ কবিতা ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁ'র অধিকার ছিল এবং তিনি বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্রের উর্দু অনুবাদ ক'রে গিয়েছেন। শেষ জীবনে তাঁ'র মতের পরিবর্তন ঘটলেও প্রথম দিকে তিনি ভারতীয় জাতীয়তার সাধক ছিলেন। 'হিন্দুস্তান হমারা' তাঁ'র সেদিনের মন্ত্র। ভারতবর্ষকে তিনি 'সকল দেশের সেরা' ব'লে প্রশংসা ক'রেছেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ভারতের সন্তান, মন্দির ও মস্‌জিদ উভয়ই ভারতের পুণ্য পূজা-ক্ষেত্র, হিন্দু মুসলমানের মিলনেই ভারতের প্রকৃত উন্নতি, এই তাঁ'র অনেক কবিতার ও গানের সারমর্ম। 'শিবালয়' সম্বন্ধে তাঁ'র একটি সুন্দর কবিতা আছে। এই সকল রচনায় তাঁ'র অসাম্প্রদায়িক কবি-হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

'আস্‌রার-ই-খুদি' বা আত্মতত্ত্ব তাঁ'র একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কেম্‌ব্রিজ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি ভাষার অধ্যাপক মিঃ রেনল্‌ড্‌ এ. নিকল্‌সন্‌ এই বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ ক'রেছেন। দার্শনিক ভাব এবং কবি-কল্পনার সমবায়ে এ রচনা উপাদেয়। জীবন ও ভগবান্‌

সম্বন্ধে কবির ধারণা এতে রূপ পেয়েছে। আত্ম-অস্বীকার নয়, আত্ম-প্রতিষ্ঠাই তাঁ'র মতে মানব-ধর্ম, ব্যক্তিত্ব-বিকাশে তা'র সার্থকতা। বিশ্বজীবন কল্পনামাত্র, ব্যক্তিজীবনই সত্য। ভগবান্ ব্যক্তিত্বহীন বা নির্গুণ ন'ন, তিনি ব্যক্তিত্বশালী পরম শক্তি, তাঁ'র বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক। বিশ্বের যাঁ'রা স্রষ্টা, ভগবান তাঁ'দের সর্বশ্রেষ্ঠ। ("মঙ্গলময় ভগবান্—সৃষ্টি যাঁ'রা করেন, তাঁ'দের সবার শ্রেষ্ঠ"—ইক্‌বাল।) এজগতে পূর্ণ সত্য ব'লে কিছু নেই, জগৎ অপূর্ণ। জীবনের কেন্দ্র হ'চ্ছে 'আমিত্ব' বা ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব-বিকাশে যা' সাহায্য করে. তাই গ্রহণীয়, যা' ব্যাঘাত জন্মায়, তা বর্জনীয়। সাহিত্য, ধর্ম, নীতি, সবক্ষেত্রেই তিনি এই আদর্শের পক্ষপাতী। শক্তির পূজারী কবি সর্বপ্রকার দৌর্বল্যের নিন্দা ক'রে গিয়েছেন। সংগ্রামকে ভয় ক'রলে চলবেনা। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ঘটে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, তা'র অভাবে আসে শৈথিল্য, আসে অবসাদ।

ভারতের লক্ষ্যচ্যুত বৈরাগ্যবাদ থেকে আজ মনের মুক্তি আবশ্যক। হয়তো ইক্‌বালের কাব্য থেকে আমরা নূতন প্রেরণা পা'ব। আমাদের নিদ্রাতুর হৃদয়ে শুনতে পা'ব মরুচারী জীবনের আহ্বান, নিক্কণশ্রান্ত কর্ণে বেজে উঠবে অশ্বখুরশব্দ।

১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁ'র তিরোধান হ'য়েছে। তাঁ'র সাহিত্যে তিনি রেখে গেছেন অফুরন্ত প্রাণের ভাণ্ডার, অমর আত্মার অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ।

[পাকিস্তান, ঢাকা। ২১শে অক্টোবর, ১৯৪২]

আধুনিক বাংলা কবিতা

বাংলাসাহিত্যে আধুনিক যুগ ব'লতে আমরা অনেক সময়ে ইংরেজ-আমলের গোড়া থেকে ধরি। এখানে কথাটিকে তত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ ক'রছিনা। বাংলা কাব্যে ইংরেজ-আমলে যে নবযুগের আরম্ভ হ'য়েছিল, তার প্রথম পর্বের গুরু মধুসূদন, দ্বিতীয় পর্বের নেতা রবীন্দ্রনাথ। আমরা এখানে দ্বিতীয় পর্বের কথা বিশেষ ক'রে আলোচনা ক'রব।

মধু-হেম-নবীন পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক কাব্য-রচনার অবকাশে কদাচিৎ আপন সুখদুঃখের গান গেয়েছেন। বিহারীলালের হৃদয়গীতি সেদিন সাহিত্যকুঞ্জের একপ্রান্তে কোথায় বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে, বেশী লোকের কানে পৌঁছয়নি। নগরীর পাষাণ-বেষ্টনে বন্দী বালক রবীন্দ্রনাথের মন যেদিন মুক্ত প্রকৃতির স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে উঠেছিল, সেদিন থেকেই তিনি বিহারীলালের সংসার-পলাতক কবি-কল্পনাকে ভালোবেসেছিলেন। তা'র পর তাঁর মন কখনও নীড় বাঁধতে চেয়েছে বাংলার পল্লীপ্রান্তে, কখনও বিচরণ করতে চেয়েছে দেশ-দেশান্তরের বহুবিচিত্র পথে। বিহারীলালের আরাধ্যা ছিলেন সারদা, রবীন্দ্রনাথের 'খেয়ালের ধন' জীবন-দেবতা।

রবীন্দ্রনাথ কা'কে বেশী ভালোবেসেছেন—মানুষকে, না প্রকৃতিকে? আমার তো মনে হয়, প্রকৃতিকে। সংসারের হাসি-অশ্রু স্পর্শ করেছে তাঁর মন, কিন্তু সংসার-বন্ধনে সম্পূর্ণরূপে তিনি কোনদিন ধরা দেননি। বারে বারে তাঁর হৃদয় ব'লে উঠেছে:
"হে সুদূর, আমি উদাসী।"

কখনও স্বপ্নপথে তিনি উপনীত হ'য়েছেন শিপ্রানদীতীরে উজ্জয়িনী-পুরে, অথবা 'পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে' দশার্ণগ্রামে, কখনও কল্পনায় দেখেছেন 'পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ' সুদুর্গম দূর দেশের ছবি, কখনও বা অন্যতর চিত্র—

"সমুদ্রের তটে
ছোট ছোট নীলবর্ণ পর্বত-সংকটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে
সঙ্কীর্ণ নদীটি চলি' আসে কোন মতে
আঁকিয়া বাঁকিয়া।"

মানুষের কথা ব'লতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কথা বেশী ক'রে ব'লেছেন। প্রকৃতির কোলে যুগ যুগান্তর এই জীবনের মেলা। আমাদের হাসিকান্নায় সে মেশায় তা'র আপন সুর। রক্তে-রক্তে লাগে তা'র চঞ্চল-করা স্পর্শ। প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনের এই যোগা-যোগের কথা কত রূপে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গানে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে। মনে পড়ে—'যেতে নাহি দিব', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'যোগাযোগ', 'ডাকঘর' আরও কত কি! 'পলাতকা'য় মঞ্জুলিকার যৌবন-চিত্র :

"জানলা ধ'রে চুপ ক'রে সে বাইরে চেয়ে থাকে,
যেখানে ঐ সজনে গাছের ফুলের ঝুরি বেড়ার গায়ে
রাশিরাশি হাসির ঘায়ে
আকাশটারে পাগল করে দিবস রাত্তি।"

দূর-দূরান্তরে প্রকৃতির উদার আহ্বান।

"আমি, বাহির হইব ব'লে
সারাদিন যেন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে।"

বাইরের আহ্বান তাঁ'কে আকুল ক'রে তোলে, সে আহ্বান যে জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয় দেবতার। "তারে নিয়ে হ'লনা ঘর বাঁধা, পথে পথেই নিত্য তা'রে সাধা।"

তাই তো ক্ষুদ্র আসক্তিতে বাঁধা পড়েনি তাঁ'র হৃদয়। বাসনা-মোহ যখনই বাঁধতে চায়, অমনি মন বলে "এ মোহ ক'দিন থাকে? এ মায়া মিলায়।"

*

যে সংসার-বন্ধন থেকে রবীন্দ্রনাথ বারে বারে মুক্তি চেয়েছেন, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেই বন্ধনেরই মুগ্ধ গায়ক। সংসারের প্রতিদিনকার ছোটখাট সুখদুঃখ, দাম্পত্য প্রেমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমান, সংকোচ, লীলা-কৌতুক—এই সবই তাঁর অধিকাংশ কবিতার উপাদান। দূর দিগন্তের হাতছানি তাতে নেই, গৃহের স্নিগ্ধ ছায়া সেখানে বিস্তৃত।

"চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি
রূপের পূজারী।
সারা সন্ধ্যা সারা নিশি রূপ-বৃন্দাবনে বসি
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি।"

ভোগে অনাসক্তির সুর তাঁ'তে নেই, প্রিয়ার বাহু-বন্ধন থেকে তিনি মুক্তি প্রার্থনা করেননি। সংসারের রূপ-রসেই তাঁ'র আনন্দ; ভোগাসক্তির একটি মধুর সুর তাঁ'র কবিতাগুলিতে জড়িত হ'য়ে আছে।

"দাও দাও একটি চুম্বন।
মিলনের উপকূলে সাগর-সঙ্গমে
দুর্জয় বানের মুখে ভাসাইয়া দিব সুখে
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন।"

'নারীমঙ্গল', 'গান শোনা', 'দীপহস্তে যুবতী', 'লাজ-ভাঙানো'—সর্বত্রই সংসার জীবনের বিচিত্র মাধুরী। রবীন্দ্রনাথের বেলায় মনে হয়, মানুষ অপেক্ষা প্রকৃতি তাঁ'র প্রিয়তর, দেবেন্দ্রনাথের বেলা তা' নয়। তিনি মানুষের রূপে, গুণে তন্ময়। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে স্বর্গীয় কবি মনোমোহন ঘোষের নিম্নোদ্ধৃত ছত্র কয়টি মনে পড়ে।

"বনের মর্মর চেয়ে মানুষের কলধ্বনি কতনা মধুর
জীবন-কানন-কোণে অজানা পাতাটি যেই গাহে মৃদু সুর,
সেও কত আছে সুখে! থামাও প্রকৃতি তব নিষ্ফল গুঞ্জন,
বাতাসের সাথে প্রেম হয় কি, পাতার সাথে চলে আলাপন?"

[লেখকের অনুবাদ]*

---

* "O murmur of men more sweet than all the wood's caresses,
How sweet only to be an unknown leaf that sings
In the forest of life! Cease, Nature, thy whisperings,
Can I talk with leaves, or fall in love with breezes?"

[London: Songs of Love and Death]

তাঁ'র এই সংসার-প্রেমই পরে ভগবৎপ্রেমে বিলীন হয়েছে; 'অশোকগুচ্ছ', 'গোলাপগুচ্ছ', 'শেফালিগুচ্ছে' যে ডালি তিনি সাজিয়েছিলেন, তা' 'অপূর্ব নৈবেদ্য' হ'য়ে উঠেছে।

*　　*　　*

স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতায়ও শুনি ভোগাসক্তির এই সুমধুর সুর। ইন্দ্রিয়ের সকল মাধুরী এঁদের কবিতায় আছে, কিন্তু মনের রসায়নে ইন্দ্রিয়মোহ অপরূপ হ'য়ে উঠেছে। এ ইন্দ্রিয়মোহ স্থূল দেহ-বাদ নয়, দেহের প্রতিমায় আত্মারই উপাসনা। গোবিন্দচন্দ্র তাই মুক্তকণ্ঠে গেয়েছেন:

"আমি তা'রে ভালোবাসি অস্থি মাংস সহ।
আমি নাহি বুঝি পাপ,
নাহি বুঝি অভিশাপ,
কনকের গৃহে কিসে নরক-সংগ্রহ।
জড় কিসে নীচ তুচ্ছ
আত্মা কিসে মহা উচ্চ
আমি তো বুঝিনা ভেদ, তোমরাই কহ।
সে কি গো সোঽহং নয়?
'আমি' পূর্ণ বিশ্বময়,
অনন্ত পুরুষ আমি আদি পিতামহ।
প্রকৃতি দেহার্ধ মম,
প্রাণাধিক প্রিয়তম,
মহাকাল দেখে নাই তাহার বিরহ।

… … …

থা'ক্ তা'র শত পাপ,
থা'ক শত অভিশাপ,
সে আমার বিধাতার মহা অনুগ্রহ।
আমি তা'রে ভালোবাসি অস্থি মাংস সহ।"

যে যত্নকৃত অতিলালিত্য আজ বাংলা কবিতার প্রাণকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে, গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা তা' থেকে আশ্চর্যজনকরূপে মুক্ত। কোথাও কোথাও হয়তো কবি একটু অসতর্ক হ'য়ে পড়েছেন, ভাষায় ঈষৎ রুক্ষতা দেখা দিয়েছে, কিন্তু তাঁর কবিতা প্রাণহীন ছলনামাত্র নয়; অদম্য আবেগে পরিপূর্ণ, সাবলীল পৌরুষদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, সর্বত্র সজীব, সতেজ ও বেগবান্। কোনও মতবাদ বা স্বপ্ন থেকে নয়, বাস্তব জীবন থেকেই তাঁ'র কবিতার জন্ম, তাই তাঁ'র কবিতা থেকে কবিকে অনায়াসে চিনে নেওয়া যায়। 'মোক্ষদা', 'কিশোরী' 'কাঁথা সেলাই', 'পাঠ', 'পুষ্পসজ্জা', 'ফুলদানী'—সবই দৈনন্দিন জীবনের ছবি। প্রত্যেকটি ছবি সুন্দর ও স্পষ্ট। রুক্ষ তীব্র ভাষায় যে অসাধারণ শক্তি সঞ্চার সম্ভবপর, আপাত-লালিত্য অপেক্ষা যে শাণিত শব্দতীর সহজে হৃদয় বিদ্ধ করে, গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা তা'র প্রকৃষ্ট নিদর্শন। জননীর কোল থেকে সন্তানের বিদায়, নিদারুণ সে বিচ্ছেদ-বেদনা, কে জানত, নিয়তির চক্রান্তে এই বিদায়ই হ'বে শেষ বিদায়? নৌকাখানি দূরে চ'লে যাচ্ছে, মায়ের চোখ আসে ঝাপ্সা হ'য়ে,

"স্নেহময় সে চাহনি, সে বন্ধন হায়
দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।"

"দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়"—স্বপ্নকোমল কথার মালা নয়, কিন্তু এর চেয়ে মর্মস্পর্শী ভাষা বোধহয় আর কিছুই হ'তে পারতনা।

* * *

দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রজনীকান্ত—এঁরাও রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। দেশপ্রেমের গানে দ্বিজেন্দ্রলাল সারা দেশকে মাতিয়েছেন। ঐ সকল গানের উৎকর্ষ সর্বজনস্বীকৃত। হাসির গানেও তাঁ'র তুলনা নেই। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সরল ঋজু প্রকাশ-ভঙ্গীর পক্ষপাতী। তাঁ'র প্রেম এবং বাৎসল্যের কয়েকটি কবিতাও অত্যন্ত মধুর ও মর্ম-স্পর্শী। দু'এক জায়গায়, মনে হয়, সহজ ক'রতে গিয়ে তিনি ভাষার লালিত্যের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেননি। রজনীকান্তের অধিকাংশ রচনাই গান। অনাড়ম্বর আন্তরিক ভাব সেগুলিকে হৃদয়গ্রাহী ক'রেছে।

* * *

প্রগাঢ় অনুভূতি ও শিল্পসঙ্গতির অপূর্ব মিলন হ'য়েছে অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতায়। প্রতিটি মূর্তি নিপুণভাবে পাথর কেটে তৈরি; প্রতিটি চিত্র বলিষ্ঠ রেখায়, সংযত বর্ণবিন্যাসে অপরূপ। শিল্প ও ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁ'র ধারণা :

> "কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্তি নয়,
> ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয়, হৃদয়।"

হৃদয় তাঁর অনুভূতিশীল ; কিন্তু তাঁ'র অনুভূতি ফেনিল উচ্ছ্বাসে আপনাকে নিঃস্ব ক'রে দেয়না, তা' সংযত এবং গভীর। প্রত্যেকটি কথা যেন অন্তরের অন্তস্তল থেকে গম্ভীর স্বরে বেরিয়ে আসছে। যতটুকু শুনি, তার অন্তরালে অনুভব করি মহাসমুদ্রের অতলতা। ক্ষুদ্র 'শঙ্খে' সংহত হ'য়েছে সাগর-কল্লোল। লঘু চাপল্যে মনের কথাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে তিনি হাওয়ায় উড়িয়ে দেননি, মিত বাক্যে তাকে ঘনীভূত ক'রে তুলেছেন।

'বঙ্গভূমি' কবিতার প্রত্যেক স্তবকে ফুটে উঠেছে বঙ্গের এক-একটি অঞ্চলের গৌরবময়ী মূর্তি। শব্দের পাথর কেটে সে মূর্তি রচিত। আবশ্যকমত চিত্রণ-নৈপুণ্যের এবং ধ্বনি-ঝঙ্কারেরও অভাব নেই।

"বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
ব'সে আছ মেঘস্তূপে অসিতবরণা,
নক্রকুল নততুণ্ড পড়ি' পদমূলে
তুলি' শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।"

অথবা,

"নিস্তব্ধ জয়ন্তীচূড়ে সান্দ্র অন্ধকার,
কণ্টকী লতায় গেছে গিরিভূমি ভরি'
গহ্বরে গহ্বরে বন্য বরাহ ঘূৎকার,
বহি'ছে উত্তর বায়ু শিহরি' শিহরি'।"

এ সকল অংশে বিষয়-অনুযায়ী শব্দ-নির্বাচনে দক্ষতা এবং বর্ণনার সতেজ বলিষ্ঠ ভঙ্গী সহজেই কাব্যরসিকের মন আকর্ষণ করে।

'এষা' তাঁর পত্নী-বিয়োগের বেদনার কাব্য। এর মত মর্মস্পর্শী শোক-কাব্য বাংলা ভাষায় আর নেই। প্রত্যেকটি বর্ণনাই সত্য, কবি-গৃহের এবং কবি-মনের যথাযথ চিত্র; প্রত্যেকটি অন্তরের গভীর আবেগ থেকে স্বতঃ উৎসারিত।

* * *

রবীন্দ্রোত্তর প্রথম কবি-দলের মধ্যে সব-চেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। অনুবাদ-কবিতায় তাঁ'র জুড়ি নেই। নানা তীর্থের সলিল আর রেণু সংগ্রহ ক'রেছেন তিনি 'তীর্থ সলিলে' এবং 'তীর্থ

রেণু'তে। শব্দসম্পদে আর ছন্দোঝঙ্কারে তাঁ'র কাব্য বিশেষরূপে সমৃদ্ধ। ঐতিহাসিক কবিতায় তাঁর জ্ঞানের প্রসার দেখে বিস্মিত হই। কিন্তু বহুমুখী জ্ঞান-সাধনা তাঁ'র কল্পনা-প্রবাহকে রুদ্ধ করেনি। শিশুর মত কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তিনি জগৎকে দেখেছেন এবং ভালোবেসেছেন। সহজ-সৌন্দর্য্যের তিনি পূজারী। ব্রত, পুরাণ, রূপকথা, বাংলার বিচিত্র উৎসব ও শিল্পকলা এবং দেশী ও বিদেশী সাহিত্য তাঁর কাব্যে প্রভাব বিস্তার ক'রেছে। নানা দেশের নানা বিষয়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ ক'রলেও বাংলার ছবিই তিনি প্রধানতঃ এঁকেছেন। বাংলার প্রাণের সুর বেজেছে তাঁ'র কাব্যে। যুগ-সমস্যার ছায়া প'ড়েছে তাঁ'র বহু কবিতায়, কিন্তু যেখানে তিনি স্বপ্ন-রাজ্যে পলাতক অথবা প্রকৃতির রূপ-মাধুরীতে মুগ্ধ, সেইখানেই তাঁ'র কবিতা সর্বাপেক্ষা সুন্দর।

* * *

করুণানিধানের অনেক কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের সুমধুর ছন্দোঝঙ্কার ও স্বপ্নদৃষ্টি আছে। 'টলমল মেঘের মাঝার' তিনি যেন ঘর বেঁধেছেন, সেখানে মেঘেরই ছায়া, মেঘেরই বর্ণবিলাস।

> "পিছন পানে চাইনু ফিরে অন্ধকারে
> চন্দ্রকলা ডুবছে মেঘের সিন্ধুপারে ;
> ঝিকমিকিছে জলের স্রোতে তারার ভাতি—
> চ'লেছি আজ এক ঠিকানায় হারিয়ে সাথী।
> মাটির প্রদীপ জ্বলছে নীরব নায়ের ' পরে
> কইছে কথা ঢেউয়ের ফেনা কলস্বরে।"

জীবনের দুঃখ বেদনাও কোমলভাবে স্পর্শ ক'রেছে তাঁকে ; বিষাদের মৃদুকরুণ সুর একটি দীর্ঘশ্বাসের মত মেঘে-মেঘে সঞ্চারিত।

"চাঁদের হাসি ডুবল কবে পাহাড়গুলোর পিঠে
সুধার নেশা লাগছেনা আর মিঠে,
বুড়ো হ'য়েই গেছে সে চাঁদ আমার সাথে সাথে,
নেই সে চুমু শারদ-জ্যোছনাতে
চুম্বকেরই টানে যখন যুগল এসে মিলত হাতে হাতে
টান পড়িত স্কুলের সে 'ছিলা'তে।"

শুধু অস্ফুট মেঘমায়া ও সমীরের মৃদু সঞ্চার নয়, মাঝেমাঝে মেঘমন্দ্রধ্বনিও বেজেছে তাঁ'র কাব্যে।

"জলবেণীরম্যা রেবা হিল্লোলিয়া বরকান্তি
উন্মাদিনীপ্রায়
অরণ্য-নেপথ্য-পথে তরঙ্গিছে শিলাঙ্গনে
তুরন্ত ধারায়।
কুন্দবর্ণ বারিধূমে আবরি' সীমন্ত বাস
ধীর আত্মহারা
কবে তুমি হে নর্মদা বিদারিলে মন্ত্রবলে
মর্মরের কারা?

.. ..

পৌর্ণমাসী অর্ধরাতে জ্যোৎস্নালোকে তন্দ্রালসে
অলিন্দের' পরে
দ্রাক্ষারসে টলমল স্বর্ণপাত্রে শশিবিম্ব
চুম্বিত অধরে,
আবর্তশোভন নাভি, অলঙ্কৃত কটিতট
হংস-মেখলায়

কোথায় রূপসী রেবা ভুলাইলে কালিদাসে
যৌবন-বিভায় ?"

কালিদাসের কল্পনাকে এমন আপন ক'রে নিতে, তাঁ'র ধ্বনিঝঙ্কার ও শব্দমাধুর্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে এমন বিমোহন চিত্র আঁকতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এযুগের আর কোন কবি এতদূর সফল হ'ননি।

পৌরাণিক কল্পনার সুগম্ভীর মহিমা কোথাও কোথাও নূতন ক'রে রূপায়িত হ'য়েছে তাঁ'র রচনায়। ভগবানের বিরাট্ সৃষ্টিলীলার রূপ কি মোহন গাম্ভীর্যে ফুটেছে তাঁ'র 'জয়দেবে'!

" পদ্মাবতী হেরিল স্বপন
মরুৎ ডমরুমন্দ্রে উতরোল অম্বুধি-গর্জন,
বিসর্পিত জলে স্থলে নিশীথের নয়ন-কজ্জল
ক্ষিপ্ত নভে জলস্তম্ভ, সংজ্ঞাহারা জ্যোতিষ্কমণ্ডল,
সেই সান্দ্র সমুদ্রের অন্ধকার ধূম্র সরোবরে
ফুটে কা'র লীলাপদ্ম! ডাকে তা'রে যুগযুগান্তরে।"

যে কবি নির্ঝরের নৃত্যচ্ছন্দ বাজিয়েছেন, তাঁরই কবিতায় সাগর তরঙ্গের এ কি কলরোল!

* * *

প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর উপরে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ের প্রভাব পড়েছে। বিশেষ ক'রে 'গৈরিক'-এর কয়েকটি কবিতার আলাপনী ভঙ্গীতে এবং উচ্ছলিতধ্বনি স্বরবৃত্ত ছন্দে দ্বিজেন্দ্র-প্রভাব সুস্পষ্ট। 'তাজে'র কয়েকটি কবিতাও সুন্দর।

"সাহারার হাহা-সম শুধু তৃষা উঠিছে উধাও
মেরি জান, আও আও কলিজামে আও"—

ভাবাবেগের তীব্র তীক্ষ্ণ সুর বেজেছে কথাগুলির মধ্যে। "বেলা যায়" তাঁর স্মরণীয় জনপ্রিয় কবিতা।

* * *

সতীশচন্দ্র রায় তরুণ বয়সে মারা গিয়েছেন কিন্তু প্রতিভার অম্লান সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন তারই মধ্যে। যেমন ছিল তাঁর অনুভূতির গভীরতা, তেমনি কল্পনার মৌলিকতা। রাত্রিবেলাকার চাঁদ কত কবিরই মন ভুলিয়েছে, কিন্তু 'দিবা-ভাগে চাঁদ' আর-কাউকে এমন মুগ্ধ ক'রেছে কি? তা' দেখে আর কি কা'রও মনে হয়েছে, "ডুবিয়া আছে তরী"? আকাশের নীল সাগরে সারারাত্রি ভেসে চলেছিল অবাধে; সকাল বেলায়—"সহসা আলো-ঝঞ্ঝাবাতে" চন্দ্র-তরী গিয়েছে ডুবে। আবার যখন রাত্রি বেলায় আঁধার জমে উঠবে, লক্ষদ্বীপ জাগবে আকাশে, তখন

"নবমী-চাঁদ পরীর মত শরীর-শোভা ধরি,
টানিয়া হাল, জুড়িয়া পাল, উঠিবে নড়ি' চড়ি,
উঠিবে জাগি' তরী।"

......আসে রাত্রি। "ধরণীর মধুময় ফুলে" কালো অন্ধকার যেন "এক ভ্রমর বিপুল।" আকাশে-পৃথিবীতে মধু-মিলনের উৎসব—"ধরণী গগনে লাগে মধুরস জোয়ারের টান।" সংহত, কিন্তু অব্যর্থ, ভাব-ঘন কবির ভাষা।

* * *

স্বভাবের দক্ষ চিত্রকর যতীন্দ্রমোহন বাগচী। বাংলার রূপ-শতদল পাপড়ি মেলেছে তাঁ'র কাব্যে। যখন

"নিঝুমরাতি, সুপ্ত সবাই রুদ্ধদুয়ার ঘরে
ভিজে শেওলা-নীড়ে ঘুমায় মরাল, চখী ঘুমায় চরে,
কেবল বুনো ঝাউয়ের বনে বেড়ায় ব্যস্ত ব্যাকুল বায়"

তখন "পদ্মা-চরের ভাঙা ঘরের শূন্য আঙিনাতে" ব'সে তিনি দেখেছেন জ্যোৎস্না-লক্ষ্মীর রূপ। 'কোজাগর-পূর্ণিমায়' দেখেছেন সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে "স্বচ্ছ মেঘের পালটি তুলে, জ্যোৎস্না-তরী বেয়ে" "ধরার ঘাটে" আসতে। শ্রাবণের দিনে

"হের নদীতীরে শরবনে
জাগে মর মর ধ্বনি
দেখ নদীনীরে ঢেউয়ে ঢেউয়ে
ফুঁসিয়া উঠিছে ফণী।"

......সংস্কৃত শব্দের গম্ভীর ধ্বনিও বেজেছে তাঁর কাব্যে মৃদঙ্গ-নির্ঘোষে।

"শরাস্তৃত সরোবর, তীরে তীরে তারি তালীবন শ্রেণী,
শ্যামল সরসী শিরে পদ্মবিভূষণা শৈবালের বেণী।
ধীরে নামে সন্ধ্যাসতী, ধূসর অঞ্চল অম্বরে লুটায়ে
ঝিল্লীর মঞ্জীরমালা রিমিঝিমিঝিমি বাজে পায়ে পায়ে।"

"তীরাস্তৃত শৈবালের শ্যামায়িত স্বচ্ছ অবকাশে
হংস কারণ্ডব দলে বিশ্রামের সাড়া প'ড়ে আসে
আতৃপ্ত গদ্ গদ কণ্ঠে, বিধূনিত সিক্ত পক্ষপুটে
শষ্পগন্ধে ঝিল্লীচ্ছন্দে সন্ধ্যাকাশ পূর্ণ হয়ে ওঠে।"

* * *

কালিদাস রায় সসম্মান অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তাঁর 'পর্ণ-পুটে'র জন্য। বঙ্গপল্লীর বিচিত্র রূপ-মাধুরী ফুটে উঠেছে তাঁর নিপুণ তুলিকা-স্পর্শে।

কেবল প্রাকৃতিক শোভা নয়, পল্লীবাসীর প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের আলো-ছায়ায় সে চিত্রমালা আরও মনোরম।

"চালের বাতায় ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো বুক চিরে চিরে ডাকে
উঠিতে বসিতে টিকটিকি পড়ে ফাটা দেয়ালের ফাঁকে।"

বিধবা 'কৃষাণী'র আঁধার কুটীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ঘরের কাজে মন লাগেনা তা'র। বিপত্নীক 'কৃষক' ক্ষেতের কাজ করতে গিয়ে উদাস হ'য়ে ওঠে। দুঃখিনী 'কুড়ানী' "পোষের বিষম কনকনে শীতে" ছোট্ট ঝুড়িটি নিয়ে ধান কুড়োতে বা'র হয়, 'পল্লীবালা' "পর-ঘরে" গেলে কাজ-কর্ম অচল হ'য়ে পড়ে, পল্লীজীবনের এই সত্য চিত্রগুলি স্পষ্ট রেখায় কবি এঁকেছেন। পল্লী-কবিতার মত তাঁ'র বৈষ্ণব-কবিতাগুলিও মধুর সরস। 'দধীচি', 'দুর্বাসা', 'প্রহ্লাদ', 'ধ্রুব' প্রভৃতি কবিতায় একটি পবিত্র পৌরাণিক সুর ধ্বনিত হ'য়েছে; কবি ইঙ্গিত ক'রেছেন নূতন অর্থের। সংস্কৃত কাব্যে তাঁ'র প্রগাঢ় জ্ঞান। তাই অনুবাদ-কবিতায় মূল সংস্কৃত কাব্যের মাধুর্য বহুলাংশে রক্ষা ক'রতে পেরেছেন তিনি।

* * *

কুমুদরঞ্জন কুণ্ঠাভরে তাঁ'র "দীন-পল্লীর মেঠো গান" নিয়ে সাহিত্য-সভায় প্রবেশ ক'রেছিলেন। সাহিত্যিক-সমাজ সমাদরে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন তাঁ'কে। তিনিও প্রাণ খুলে শুনিয়েছিলেন আমাদের, 'দুঃখিনীর আমগাছ', 'পুত্রহারা কটার মা'য়ের কথা—অজয়-তীরের অনেক কাহিনী। কা'র উঠানে "হলুদ ঝিঙা ফুল দুলে", কোন্ পল্লী-কবি "'শশকশিশু ধরি', রাখত বুকে করি'", কোথায় আছে 'শ্রীমন' আর কোথায় 'নোটন'—সহজ আন্তরিকতা নিয়ে সকলের কথা ব'লে

গেছেন তিনি। "মাঝি তরী হেথা বেঁধোনাক" গানটির সরল করুণ সুর একদিন সারা বাংলাদেশের হৃদয় স্পর্শ ক'রেছিল।

* * *

মহিলা-কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমতী কামিনী রায়। 'আলো ও ছায়া'র ভূমিকায় কবি হেমচন্দ্র তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা না করলেও রচনা-সৌষ্ঠবের সুখ্যাতি ক'রেছেন। একটি কোমল করুণ আভা তাঁ'র কাব্যলক্ষ্মীর মুখে যেন লেগে আছে।

> "এসেছিনু ভিখারিণী দীনা, ভিক্ষাবৃত্তি ছিল না ত' জানা,
> জানিনি ত' এমন কঠিন প্রাণ দিয়ে প্রাণ টেনে আনা।
> ভালো হ'ল, তুমি জানো নাই এ জনার দরিদ্রতা কত,
> হাসিমুখে ঘরে ফিরে যাই গান গেয়ে সুখীদের মত।"

প্রেম, অভিমান, সংকোচ সব মিলে একটি মধুর ভাবরস সৃষ্টি ক'রেছে উপরের চা'রটি পংক্তিতে।

প্রকাশ-কুণ্ঠিত সলজ্জ ভালোবাসার ছবি ফুটেছে তাঁর অনেক কবিতায়। সে ভালোবাসা পবিত্র, নির্মল।

> "শুনিয়াছি, কাতরে ডাকিলে হৃদে যায় হৃদয়ের ডাক,
> এ আহ্বান পৌঁছিয়াছে তবে এ বিশ্বের যেথাই সে থা'ক।"

অশ্রুর উৎসারকে লুকোতে চেয়েছেন কবি ক্ষণিক হাসির আড়ালে।

> "হাসো সখি, মহাবনে আঁধার নিভৃত,
> এই ক্ষুদ্র প্রান্তটুকু হোক কুসুমিত।"

যেমন প্রেমের, তেমনি স্নেহের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে নারীহৃদয়ের সহজ সৌকুমার্য।

"দুখানি সুগোল বাহু, দু'খানি কোমল কর
স্নেহ যেন দেহ ধরি' হেথায় বেঁধেছে ঘর।
সাধ হয়, কাছে টানি, মালা ক'রে পরি গলে
এ হাত উঠাবে স্বর্গে ডুবাবে বা রসাতলে।"

'পুণ্ডরীক' ও 'মহাশ্বেতা' তাঁ'র বিদ্যা, কল্পনা ও প্রকাশ-নৈপুণ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন।

মানকুমারী বসুর কবিতায় কারুকলা বেশী নেই, কিন্তু অনাড়ম্বর স্বাভাবিক মাধুর্য্য আছে। 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' এবং 'কনকাঞ্জলি' কাব্যানুরাগীর উপেক্ষার বস্তু নয়।

* * *

কোমল ছন্দোঝঙ্কার এবং ললিত-তরল শব্দ-প্রবাহের যুগে মোহিতলাল এনেছেন পৌরুষদৃপ্ত ভঙ্গী। রবীন্দ্র-প্রভাবের মোহ অতিক্রম ক'রে তিনি একটি নূতন ভাব-মণ্ডল রচনা ক'রতে চেয়েছেন। গতানুগতিকতার স্রোতে ভেসে যাওয়া তাঁর স্বভাব নয়, স্বাতন্ত্র্যের উপাসক তিনি। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে তিনি দেখেছেন অপরিণত সম্ভাবনার এক বিশাল রহস্যলোক। মধুসূদনের মেঘমন্দ্র-ধ্বনি, অক্ষয়কুমারের সংযত বলিষ্ঠ কল্পনা, সুরেন্দ্রনাথের চিন্তাশীলতা এবং দেবেন্দ্রনাথের সংসার-প্রীতি তাঁ'র কবি-মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ ক'রেছে। জীবন-রহস্য-মুগ্ধ কবি 'গভীর সুরে গভীর কথা' বলতে চেয়েছেন। 'স্বপন-পসারী'তে একদিন তিনি স্বপন ফিরি ক'রে বেড়িয়েছিলেন বটে, কিন্তু 'বিস্মরণী' ও 'স্মরগরলে' চিন্তার দৃঢ়তা এবং ভাবের গাঢ়তা এসেছে। আর লঘু মেঘমায়া নয়, মর্ত্ত্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে 'জীবন-মরণময় সুগম্ভীর গান' গাইতে চেয়েছেন তিনি।

দুঃখ ও অতৃপ্তির সুর তাঁ'র কবিতায় প্রবল। তীব্র ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং অতৃপ্তি—অন্তরের এই দ্বন্দ্বে কবি জর্জরিত। কামনা প্রাকৃতিক শক্তি, তারই কাছে মানুষের নিত্য পরাজয় কবিকে বিহ্বল ক'রেছে। দেহ ছাড়া প্রাণ নেই, 'রূপতান্ত্রিক' কবি দেহকে উপেক্ষা ক'রতে পারেন না,—

"জানিতে চাহিনা আমি কামনার শেষ কোথা আছে,
ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করি' জ্বালি কামানল।"

কিন্তু দেহের উপাসনায় প্রাণ অবসন্ন হয়ে পড়ে, মনে হয়,

"প্রাণ ভরা সেই গানে লেগেছে হিমেল হাওয়া
আজি এ দিনান্ত বরষায়,
নেমেছে অকাল সন্ধ্যা বৃথা মুখপানে চাওয়া
ছন্দ নাই, ভাষা না জুয়ায়।
নিদ্রাহারা দীর্ঘরাত্রি, কেমনে হইব পার
দুস্তর তিমিরতরঙ্গিণী ?
বনপথে পথে শিবা- দের অশিবচীৎকার
তৃণদলে ঝিল্লীর শিঞ্জিনী।
তার মাঝে তুমি কোথা ? হা অভাগ্য পুরোহিত,
কোথা আশা, কোথা সে পিপাসা ?
প্রাণযজ্ঞে দেহ কোথা, কোথা রক্ত সুলোহিত
সঞ্জীবন শক্তিমন্ত্রভাষা ?"

নানা দিক্ থেকে ভাব আহরণ ক'রে তিনি তাঁ'র কাব্যকে বিচিত্র শোভায় সমৃদ্ধ ক'রেছেন। 'বেদুঈন', 'নাদিরশাহের জাগরণ', 'নাদিরশাহের শেষ', 'হাফিজের অনুসরণে' প্রভৃতি কবিতায় তিনি এনেছেন আরব-পারস্যের সুর। 'শেষ শয্যায় নূরজাহান' অতি মধুর

করুণ নাটকীয় গীতিকবিতা। এই সব কবিতায় পরিবেশ সৃষ্টিতে কবি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শব্দবিন্যাস ও বর্ণনাভঙ্গী সর্বত্রই বিষয়ানুযায়ী। প্রয়োজনমত আরবী পারসী শব্দ মিশিয়ে তিনি মুস্‌লিম জীবনের একটি স্বাভাবিক ভাবমণ্ডল রচনা ক'রেছেন। 'দিল্‌দরদী নীলদরিয়া দারাত্‌ জুলজুল'—বেদুঈনের এই গীতিসুর কানে ও মনে রেশ রেখে যায়। "নটকান্‌রাঙা আলোটি পড়েছে মিনারচূড়ায় শাহ্‌দারার" বা "টুকটুকেনথ নীলা কবুতর আলিসার 'পরে আর না নাচে" মোগল যুগের শিল্পের মতই পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। আবার উপনিষদ থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে 'মৃত্যু ও নচিকেতা'য় তিনি জীবনমৃত্যুরহস্যের যে রূপ এঁকেছেন তা'ও অপূর্ব। এই সব প্রাচীন কাহিনীর অবতারণায় যে প্রশান্ত গাম্ভীর্য এবং প্রগাঢ় উপলব্ধির প্রয়োজন, মোহিতলালের তা' আছে। তাই বিষয়ের মর্যাদা তাঁ'র হাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি। কোমল গীতিঝঙ্কার তাঁ'র কবিতায় থাকলেও তিনি প্রধানতঃ ভাব-নিবিড় সংহত প্রকাশভঙ্গীর পক্ষপাতী। তাই সনেটের গাঢ় বন্ধনে এবং পৌরাণিক বিষয় বর্ণনে, তাঁ'র কল্পনা সর্বাপেক্ষা বেশী সাফল্য লাভ ক'রেছে। সংস্কৃত শব্দের নিপুণ প্রয়োগ তাঁ'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

* * *

মোহিতলালের কল্পনা সংগতি ও সংহতির অনুরাগী; নজরুলের প্রকৃতি তা'র বিপরীত। অশান্ত চঞ্চল দুর্মদ জীবনের গান ধ্বনিত হ'য়েছে তাঁ'র উচ্ছ্বাস-ফেনিল ভাষায়। অমিত প্রাণাবেগ ভাষার গতানুগতিক নিয়মবন্ধনকে অগ্রাহ্য ক'রে ছুটে চলেছে পাগলা ঝোরার মত। 'বিদ্রোহী' তাঁ'র দোষগুণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

অসাধারণ কবি-শক্তির প্রমাণ ওতে রয়েছে, নিঃসন্দেহ, কিন্তু ভাষা পরিমিত বা যথাযথ নয়। উন্মাদনার অগ্নিবীণা বাজিয়েছেন তিনি আত্মহারা হ'য়ে। 'প্রলয়োল্লাস' কবিতা-হিসাবে 'বিদ্রোহী' অপেক্ষা সার্থক। ভাব ও ভাষার অসঙ্গতি এতে বিশেষ নেই। অনেক কবিতায় মনের কথাকে সংযত করেননি তিনি, তাই শিল্প-সৌষ্ঠব ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবে একথাও সত্য, যে উদ্দাম আবেগ তাঁ'র কবিতার প্রাণ, সংযত করতে গেলে তা'র স্বাভাবিক সৌন্দর্যের হানি হ'ত। মরুর ঝড়কে মলয়-মারুতে পরিণত ক'রবার চেষ্টা বৃথা।

মুক্তি-অনুরাগী কবি সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র গণ্ডী অস্বীকার ক'রে চ'লেছেন। হিন্দু ও মুস্‌লিম সংস্কৃতি তাঁ'র হৃদয়ে সমন্বয়ের পথ খুঁজেছে। হিন্দুর পৌরাণিক কল্পনা ও ঐতিহাসিক কীর্তিকথাকে সাদরে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা আসেনি তাঁ'র মনে। দেশের গৌরব ব'লেই তিনি তা'কে মেনে নিয়েছেন।

দু'টি সুর বেজেছে তাঁ'র কাব্যে—রুদ্রের ও মধুরের। 'অগ্নিবীণা'য় যে শিখা আকাশস্পর্শী হ'য়ে উঠেছিল, 'ছায়ানটে' তা' নির্বাপিত; সেখানে লতায় লতায় স্নিগ্ধ বনতল, নেমেছে সন্ধ্যার করুণ ছায়া। তাঁ'র কোমল গীতিমালায় আছে কাননের ছায়ানৃত্য, পুষ্পদলের কোমলতা।

* * *

দুঃখদৈন্য জর্জরিত কর্মভারক্লান্ত আধুনিক জীবনের বাস্তবরূপ এঁকেছেন যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত। 'ডাকহরকরা'র' ত্রস্তব্যস্ততায়, বিষম বোশেখীরোদে স্টেসনের যাত্রীদের হুড়াহুড়িতে এবং বর্তমানকালের জটিল জীবনসমস্যায় তিনি পেয়েছেন নবরসের সন্ধান। রবীন্দ্রপ্রভাব

থেকে মুক্ত হ'বার প্রয়াস মোহিতলালের কাব্যে দেখা দিয়েছে এক রূপে, যতীন্দ্রনাথে অন্যরূপে। বাস্তবতার কবি ব'লে তিনি প্রসিদ্ধ, কিন্তু কল্পনাসম্পদে তিনি দীন ন'ন, তা'র প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে 'সায়ম্-এ'।

* * *

বাংলা কাব্যে পুরাতন পল্লী গাথার সুর সংযোগ ক'রেছেন জসিম উদ্দীন। রাবীন্দ্রিক প্রভাবের স্পর্শে তাঁ'র পল্লীগীতি পেয়েছে কতকটা মার্জিত শ্রী। 'নক্সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' এবং তাঁর খণ্ডকবিতাগুলি প্রকাশরীতির নূতনত্বের দিক্ দিয়ে উল্লেখযোগ্য।

* * *

নবযুগের অন্তরের রূপ সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তা'র দুঃখ দৈন্য হতাশা, নাগরিক জীবনের যান্ত্রিক গতি, সভ্যতার রথচক্রে নিষ্পেষিত অসংখ্য নরনারীর মর্ম-যাতনা বেদনা-কম্পিত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁ'র কবিতায়। ধরিত্রীর কোলে দেবতা আসেন, কিন্তু দু'দিন পরে দেখি,

"কোথা মোর ভগবান ?
জীর্ণ গৃহ, আবর্জনা চারিদিকে,
তার মাঝে আলোহীন বায়ুহীন কক্ষে
ছিন্ন শয্যা ' পরে শুয়ে
দেবতা আমার
ফেলে দীর্ঘশ্বাস !

আলোকের দেবতার আলো নাহি মিলে,
মিলে না ক' বায়ু!
রজনীর লক্ষ তারা চেয়ে চেয়ে খোঁজে আর কাঁদে
দেবতারে খুঁজে নাহি পায়।"

শহরের ভাড়াটে কুঠিতে আমরা "নদীর স্রোতের জঞ্জালসম আসিয়া জুটি"; কেউ কাউকে চিনিনা, পাশাপাশি দিনের পর দিন কাটিয়েও অপরিচিত থেকে যাই।

"ও ধারের ঘরে তাহাদের ছেলে
বুঝিবা ধুঁকিছে জ্বরে,
এধারে প্রবাসী স্বামীটির লাগি
বধূটি শুকায়ে মরে,
নীচে মজলিসে সারাদিন গোল,
চলিছে দাবার ঘুঁটি,
ভাড়াটে কুঠি!"

হঠাৎ একদিন ভাড়াটে কুঠি ছেড়ে যাবার দিন আসে, অপরিচয়ের ব্যবধান সেদিনও পূর্বের মতই র'য়ে যায়।

"শুধু কোনদিন সঙ্গবিহীন
বিদ্রোহ করে প্রাণ,
কঠিন দেয়ালে করাঘাত করে
ঘুচাইতে ব্যবধান।
ঘোচেনা আড়াল, ব্যাকুল হৃদয়
মিছে মরে মাথা কুটি'
ভাড়াটে কুঠি।"

নবীনতর কবিদের মধ্যে কেউবা পুরাণো রীতির অনুসরণ ক'রছেন' কেউবা নূতন প্রকাশরীতির সন্ধান ক'রছেন। তাঁ'দের দু'একজনের রচনা স্থানে স্থানে সুন্দর হ'লেও এখন পর্যন্ত তাঁ'রা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের বা পরিণত কবিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। তাই তাঁদের রচনা এখনও স্থায়ী গৌরব অর্জনের যোগ্যতা লাভ করেনি।

[বঙ্গশ্রী, পৌষ, ১৩৪৫]

বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে দেশে আজ চিন্তা করবার লোক আছে, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাংলা সম্বন্ধে ঔৎসুক্যও যেমন কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে, তেমনি সাধারণের মধ্যে এর প্রতি অবহেলাও নিতান্ত কম নয়। দেশময় আজ যে বাচালতা ও ছলনার আতিশয্য দেখা দিয়েছে, তা জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী। ভাবের ক্ষেত্রেই হোক, আর ধর্মের ক্ষেত্রেই হোক নিষ্ঠা ও সাধনার মূল্য অপরিসীম। অথচ সাধনার অভাব আজ বাঙালী চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জীবন ও সাহিত্যের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জীবনসমুদ্রের ডুবুরী যাঁ'রা, তাঁ'রাই এর রতন-মাণিক্যের খোঁজ রাখেন। কিন্তু নবীন-সাহিত্য-বিলাসী চান সস্তায় নাম কেনা। জীবনের বিপুল রহস্য তাঁ'কে প্রলুব্ধ করেনা। প্রকৃতি ও জীবনের অপরূপ মহিমায় যাঁ'দের চোখ ভুলেছে, মন ভুলেছে, তাঁ'রাই সাহিত্যে শাশ্বত সম্পদ দান ক'রে গেছেন। সে মহিমা যাঁ'রা দেখতে পাননি, তাঁ'রা প্রকৃত সাহিত্যের সৃষ্টি করতে পারেননি।

সুনীতির সঙ্গে সাহিত্যের বিরোধ কল্পনা করা আজ ফ্যাশন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। নীতি মানে যদি বাইরেকার অর্থহীন আচারমাত্র হয়, তবে তা'র সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ কোন যোগ নেই, একথা সত্য। কিন্তু অন্তরাত্মার যে গভীরতর নীতি, উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে যা আমাদের

মহাসত্যের অভিমুখে অগ্রসর ক'রে নিয়ে চলেছে,—তা'র সঙ্গে শিল্পের অখণ্ড যোগ র'য়েছে। সাহিত্য জীবনেরই খণ্ড প্রকাশ। জীবন ও সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখার সঙ্গত কারণ কিছু আছে ব'লে মনে হয়না। সাহিত্য-সাধনা জীবন-সাধনারই অংশমাত্র। জীবনকে যাঁ'রা বড় করতে চাননি, বড় সাহিত্য সৃষ্টির যোগ্যতাও তাঁ'দের নেই। আন্তরিকতার অভাব কৌশলে পূরণ করা চলেনা, লাবণ্যের অভাব প্রসাধনে ঘোচেনা। রূপহীনার প্রেম নিয়েও মন খুশী হ'তে পারে, কিন্তু প্রেম-হীনার রূপে মন তৃপ্তি মানেনা।

অথচ, আজ চতুর্দিকে শুধু ছলনা। বস্তুতন্ত্রের দোহাই দিয়ে অবাস্তব ভাববাষ্প বিকিরণ, গণতন্ত্রের ছলনা ক'রে দরিদ্রজীবনের মিথ্যা কুৎসা প্রচার, চায়ের টেবিলে বসে বন্দীজীবনের চিত্র কল্পনা, আরামলিপ্সু বাঙালীর এই সহস্র মিথ্যাভাষণ তা'র নিষ্ঠাহীনতারই পরিচয় দেয়। দারিদ্র্যের দুঃসহ বেদনার উদ্দেশে পূজারীর বেশে অর্ঘ্য সম্ভার নিয়ে যে বেরিয়ে পড়েনি, কি ক'রে সে দরিদ্র জীবনের মর্মের গান গাইবে তা'র গ্রন্থে? কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে তা'র সঙ্গে বাড়ী আসি ব'লেই তা'র জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ হয় প্রচুর? বস্তির আশে পাশে নজর হেনেই কি বস্তিজীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এবং নিবিড় উপলব্ধি ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য কখনই রচিত হ'তে পারেনা। গোর্কী, হাম্‌সুন শুধু প্রতিভাবান্ নন, তাঁ'রা ঐকান্তিক সাধক; দারিদ্র্যের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় তাঁ'দের দুঃখের গানে প্রাণসঞ্চার করেছে। কর্ম-জীবনের ক্ষেত্র আমাদের সঙ্কীর্ণ। কল্পনারও তাই প্রসার নেই। হ্যুগো, শেক্সপীয়ার, ইবানেজ—এঁদের রচনায় কল্পনার যে প্রসার, আমাদের সাহিত্যে তা'র অভাব। বায়রনের লেখার মহিমা বাংলা-সাহিত্যে

দুর্লভ। সাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই, কোথায় পাবো আমরা 'Toilers Of the Sea'? দৈনন্দিন জীবন আমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আছে, কোথেকে আসবে আমাদের 'Hamlet' বা 'Macbeth' এর কল্পনা? যুদ্ধের খবর শুনি দূর দূরান্তর থেকে, কি ক'রে ভাববো আমরা 'Mare Nostrum' কিম্বা 'Four Horsemen' এর প্লট? পশ্চিমের সাহিত্যে তাকিয়ে দেখি, কত অফুরন্ত বৈচিত্র্য, নবনব কল্পনা। কত স্রষ্টা, কত ভোক্তা। আমাদের সাহিত্যে কেবলি একঘেয়ে ক্ষীণ সুর, বৈচিত্র্য নেই, বিশালতা নেই। জীবনকে বড় করতে না পারলে সাহিত্যও বড় হ'য়ে উঠ্‌বে না।

মধু, হেম, নবীনের কাব্যে, এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে জীবনের বিচিত্র সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছে। বিরাট রূপ খুঁজতে গিয়ে তাঁ'দের অনেক সময়ই তাকাতে হ'য়েছে অতীতের পানে। আধুনিক জীবনের সত্যকার রূপ যাঁ'রা আঁকতে চেয়েছেন তাঁ'দেরও আমরা ভুলবনা। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, নিরুপমা দেবী ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এঁরা বাংলা দেশেরই সাহিত্যিক, দেশকে এবং জীবনকে এঁরা অন্তর দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন এবং সক্ষমও হয়েছেন। আরও সাধক কি আমরা পাবোনা? উচ্ছৃঙ্খল ভাব ও ভাষা কি আমাদের নব সাহিত্যকে বিপর্যস্ত করে ফেল্‌বে?

এম্‌নি একটা আশঙ্কার কারণ সম্প্রতি সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। ইংরাজী কথায় ভর্তি, ধনুষ্টঙ্কার-গ্রস্ত বিকৃত একশ্রেণীর বাংলা রচনা আজকের সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়েছে। এ সব রচনার ভাব ও ভাষা দুই-ই বিশৃঙ্খল। সৌন্দর্য এবং সামঞ্জস্য যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, একথা বোধ হয় তাঁ'রা অস্বীকার ক'রতে চান। এই ভাষা ও ভাব-বিভ্রাট অপ্রকৃতিস্থতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাংলার এযুগের সাহিত্যক্ষেত্রে একটি অভিযোগ অনেকদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। স্বর্গত চিত্তরঞ্জন দাস একদিন এ অভিযোগ উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর মতামত একটু একপেশে হলেও বোধহয় তাতে সত্য ছিল। অভিযোগটি হ'চ্ছে এই যে; বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগ নেই; এ যেন কৃত্রিম টবের ফুল। রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন, "এখনকার অধিকাংশ বাংলা বই প'ড়ে আমার এই মনে হয় যে, আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের সময় বাংলাদেশই ছিল কিনা, ভবিষ্যতে এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। * * * পণ্ডিতেরা বলবেন বঙ্গসাহিত্য একটা কলেজের সাহিত্য, এটা দেশের সাহিত্য নয়। কিন্তু সে কলেজটা ছিল কোথায়, এ বিষয়ে কিছুতেই মীমাংসা হ'বেনা।" সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে', 'গল্পগুচ্ছে' ও নানা কবিতায়, শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' 'অরক্ষণীয়া' প্রভৃতি আখ্যানে, দীনেন্দ্র রায়ের 'পল্লীচিত্রে' বিভূতি-ভূষণের 'পথের পাঁচালী', ও 'অপরাজিত'-য় এবং আরও দু'একজন লেখকের রচনায় খাঁটি বাংলার পরিচয় মেলে। যে আবেষ্টন ও জীবন আমাদের পরিচিত নয়, তা'র কথা আমাদের অন্তরকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করতে পারেনা। সমালোচনার মানদণ্ডে কিসের কত ওজন জানিনা, কিন্তু আমার ত' মনে হয়, স্বাভাবিকতা ও আন্তরিকতা মানুষের মনে এমন একটি তৃপ্তি এনে দেয়, যা কৌশল বা বিশ্লেষণী বুদ্ধির সম্পূর্ণ অনায়ত্ত। শুধু এই কারণেই শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীনের' চেয়ে তাঁর 'অরক্ষণীয়া' আমাকে বেশী আনন্দ দান করে। 'পথের পাঁচালী'-ও এই কারণেই আমার অত্যন্ত প্রিয়। তা'র পল্লীগ্রামের অপূর্ব মায়াপুরী, রামায়ণ মহাভারতের বিচিত্র স্বপ্নচ্ছবি দেশের যুগ যুগ-প্রবাহিত জীবনধারার সঙ্গে আমার একটি নিবিড় পরিচয়বোধকে

জাগ্রত ক'রে তোলে, আমার সহস্র স্বপ্ন ও স্মৃতি মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। লেখক ও পাঠকের মধ্যে আর ব্যবধান থাকেনা। তাঁ'র কথা যেন আমারই কথা বলে মনে হয়। দেশের সঙ্গে এই পরিচয়ের চিহ্ন আজকের অনেক লেখকের লেখায় নেই। তাই, সে-সব লেখায় কারিকুরি যতই থাকুক তা অন্তরকে স্পর্শ করেনা। (সাহিত্যে শিল্পে আমরা চাই—কৌশল নয়, হৃদয়; "কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্তি নয়; ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয়, হৃদয়।" অন্যের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারাতেই শিল্পের প্রকৃত সার্থকতা। কৌশলকে যেন আমরা আন্তরিকতার চেয়ে বেশী দাম না দিই, দেহকে যেন প্রাণের চেয়ে সম্মান না করি।) দেশের ও জাতির সত্যকার পরিচয় সাহিত্যে মিলুক, ছলনা ও প্রবঞ্চনা যেন পূজার স্থান গ্রহণ না ক'রে। আমরা যেন ভুলে না যাই, নূতনত্ব দেখানোটাই খুব বড় কথা নয়,—যা চিরন্তন, তাকে বুঝতে ও জানতে চেষ্টা না ক'রলে প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি কারও পক্ষে সম্ভব নয়। সাধনার মহান্ আদর্শ আমাদের আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর করুক। আমরা যেন বুঝতে পারি, সাহিত্যে বিশ্বজনীনতা থাক্‌বে ব'লে তাতে দেশের পরিচয় থাকবেনা, একথা মনে করা প্রকাণ্ড ভুল। সত্যি ক'রে কোন দেশের না হ'লে তা বিশ্বজনীনও নয়। একের মধ্যে দিয়ে সমগ্রের মর্মকে স্পর্শ করাই শিল্পীর কাজ। ইন্দ্রকে শরৎবাবু সত্যি করে চেনেন, তাই তা'কে আমাদের চিনিয়ে দিতে পেরেছেন। অভিজ্ঞতার বাইরে থেকে চরিত্রসৃষ্টি ক'রলে তিনি কারও কাছেই তা'কে পরিচিত ক'রে তুলতে পারতেন না। কবি তাঁ'র নিজের প্রীতির মধ্যেই প্রকাশ করেন সমগ্রের প্রীতিকে, নিজের চিন্তার দ্বারাই সমগ্রের চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। সর্বমানবের অন্তরে যে পরম ঐক্য, নিজের অন্তরে ডুব দিতে না পার্‌লে কেউ তা'র সন্ধান পায় না।

[মাতৃভূমি]

গোবিন্দচন্দ্র দাস

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের নাম যদিও আজ সাধারণের কাছে সুপরিচিত নয়, তথাপি তাঁ'র কবিত্বশক্তি চিরদিন প্রকৃত কাব্য-রসিকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রবে। আজকের শত শত চটুল ছন্দের কারসাজি ও ভাষার ভোজবাজি সাধারণ পাঠকের মনকে এমন অভিভূত ক'রে আছে যে, তাঁ'রা আর এদিক-ওদিক তাকা'বার সুযোগ পাচ্ছেননা। নতুবা গোবিন্দচন্দ্রের নাম বোধহয় বাঙালীর নিকট এমন অর্ধ-পরিচিত থেকে যেতনা। সর্বত্র তাঁ'র কবিতার যথাযোগ্য সমাদর দেখা যেত।

আজকালকার অনেক কবি শিক্ষিত, বিজ্ঞ এবং চতুর। পুরাণো কথাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে ব'লবার ক্ষমতা অনেকের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই। ছায়া-ছায়া কল্পনাগুলি একটা অস্পষ্ট প্রকাশ-চেষ্টার মধ্যে মেঘের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কৃত্রিম সাজসজ্জা যেন কাব্য-লক্ষ্মীর স্বভাবলাবণ্যকে আচ্ছন্ন, আবৃত ক'রে ফেলছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা গোবিন্দচন্দ্রের বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। তাঁ'র কবিত্বশক্তি অনেকস্থলে সরল হৃদয়োচ্ছ্বাসের মধ্যেই প্রকাশিত হ'য়েছে। যাঁ'দের সাংসারিক জীবন এবং সাহিত্যিক জীবনের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ব্যবধান আছে, গোবিন্দচন্দ্র তাঁ'দের দলে ন'ন্। তাঁ'র রচনা তাঁ'র জীবনকে অনাবৃতভাবে আমাদের নিকট প্রকাশ ক'রে দিচ্ছে। তাঁ'র জীবন থেকে সাহিত্যকে এবং সাহিত্য থেকে জীবনকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখলে, তাঁকে বোঝা যাবেনা।

তিনি ভাগ্যহীন কবি। দৈন্য এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুঝে সমস্ত জীবন কষ্ট সহ্য ক'রে অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় নিঃসহায় অবস্থায় তিনি

সংসার থেকে চিরবিদায় গ্রহণ ক'রেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁ'র মৃত্যুতে লিখেছিলেন—

"ফুল নীরবে যেমন ঝরে, তেম্নি ক'রে ম'রে গেল কবি,
চ'লে গেল মানসযাত্রী প্রজাপতির নীরব পাখার ভরে;
হাওয়া শুধু কর্‌লে হাহা, আন্‌মনে হায়; সেই সমাচার লভি'
দূরে বাঁশীর সুরের ধারা কেঁপে বারেক উঠল নিমেষ-তরে।

*   *   *

এই দুনিয়ার একটি কোণে কাঁটার বনে জন্মেছিল সে যে,
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডেরায় কাঁটার মালা গলে;
পাতায়-চাপা গন্ধটুকুন্ পূবে হাওয়ায় বেকুল নীড় ত্যেজে
পাথর-চাপা রইলো কপাল, বাদ্‌লা ক'রে রইলো চোখের জলে।
ধনজনের ধারত না ধার, চিন্‌ত তা'রে অল্প ক'টি লোকে
নয় দারোগা, নয় খেতাবী, খাতির দাবী কর্‌বে সে কোন্ মুখে?
মরমী কেউ বাস্‌ত ভালো, কল্পনা তা'র দেখ্‌ত প্রীতির চোখে,
গান গেয়ে সে গেছে চ'লে, রেশ র'য়েছে সারা দেশের বুকে।
বাদ্‌লা-রাতির সাথী সে যে শরৎপ্রাতের আলোয় গেছে ঝ'রে,
মরে নি সে, জুড়িয়ে গেছে, বঞ্চনা-লাঞ্ছনার ঝঞ্ঝা স'য়ে।
সরস্বতীর পায়ের ছায়ে যে পদ্মটি ফুটছে ত্রিকাল ধ'রে
কবি জানে, পরম-সুখে সে আছে আজ তারই পরাগ হ'য়ে।"

বাস্তবিক তাঁ'র জীবন-কথা মনে হ'লেই একটা বেদনার সুর মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে—"পাথর চাপা রইল কপাল, বাদ্‌লা ক'রে রইল চোখের জলে।"

১২৬১ সালের ৪ঠা মাঘ গোবিন্দচন্দ্র ঢাকা জেলার ভাওয়াল-জয়দেবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা কালীনারায়ণ তাঁ'কে অত্যন্ত স্নেহ ক'রতেন। কালীনারায়ণের মৃত্যুর পর রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজা হ'ন। বিখ্যাত কালীপ্রসন্ন ঘোষ তখন ভাওয়ালের প্রধান রাজকর্ম্মচারী, গোবিন্দচন্দ্র অন্যতম কার্যনির্বাহক।

রাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'ল। প্রজাবর্গের নানারূপ অসুবিধা ঘ'টতে লাগল। গোবিন্দচন্দ্র রাজাকে প্রতীকারের জন্য পত্র লিখলেন। সামান্য কর্মচারীরএ 'ঔদ্ধত্য'—রাজার, তথা কালীপ্রসন্নের ভালো লাগল না।

আরও একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। রাজ্যের দুই জন সম্ভ্রান্ত লোক এক গৃহস্থ-বধূর সর্বনাশ-সাধন ক'রতে উদ্যত হয়। গোবিন্দ-চন্দ্র এই ব্যাপারে প্রজার পক্ষ নিয়ে দাঁড়ালেন। রাজা অপরাধীদের শাস্তি দিতে বাধ্য হ'লেন। কিন্তু এতে রাজ্যের অনেক প্রতিপত্তি-শালী লোক গোবিন্দচন্দ্রের শত্রু হ'য়ে দাঁড়ালেন। ফলে, কবিকে কার্য ত্যাগ ক'রতে হ'ল। দৈন্য এবং অনশন তাঁ'র নিত্য-সঙ্গী হ'য়ে দাঁড়াল। অন্যায়, ভণ্ডামি এবং ভীরুতাকে গোবিন্দচন্দ্র তাঁ'র কবিতায় সর্বত্র কশাঘাত ক'রে চ'লেছেন। জীবনেও তা'র অন্যথা ঘটেনি।

আজীবন দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে দারুণ দুর্যোগের মধ্যে আপনার অন্তর-প্রদীপখানি জ্বালিয়ে রেখে সন্তর্পণে তাঁ'কে চ'লতে হ'য়েছে। অবজ্ঞায় অনেকেই মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেছে। ধনীর দুলাল আশ্রয়হীনের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ ক'রেছে। সৎসাহস ঔদ্ধত্য নামে আখ্যাত হ'য়েছে। কঠোর জীবন-সংগ্রাম বক্রহাস্যে ভর্ৎসিত হ'য়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে প্রেমের রশ্মি তাঁ'র মেঘান্ধকার জীবনকে বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রেছে এবং অটল পৌরুষ সমস্ত বাধা-বিঘ্নের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রবার সাহস এনে দিয়েছে। সময়ে সময়ে দৈন্য-দুঃখ তাঁ'র সাংসারিক জীবনকে বিষাক্ত ক'রে তুলেছে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তিনি আপন মনুষ্যত্বের অবমাননা করেননি।

পত্নী সারদাসুন্দরীর মৃত্যুশোক তাঁ'র কাব্যের মধ্যে অনেকস্থলেই বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে তুলেছে।

'চিলাই'-এর তীরে সারদার দেহ ভস্মীভূত হ'য়েছিল। বহুদিন পরেও তা'র স্মৃতি নিয়ে কবি লিখেছিলেন—

"আজও তার ভস্ম ছাই
বুকে রেখে চুমা খাই
আজো সে গায়ের গন্ধ বহে গন্ধবহ।
আজো তার প্রতিচ্ছায়া
ধরিয়া নূতন কায়া
স্বপনে আসিয়া করে সপত্নী-কলহ।"

দুঃখতাপক্লিষ্ট জীবনের একমাত্র আশ্রয় গৃহের শান্তি, তা'ও কবি হারালেন। অল্পদিনমধ্যে আরও অনেক আত্মীয়-স্বজন একে একে ছেড়ে গেলেন। ধ্বংসাবশেষের ক্ষীণ চিহ্নের মত কবির জীবন-পতাকা দুর্যোগের ঝড়-বাদলের মধ্যে দুলতে লাগল।

'প্রেম ও ফুল' তাঁর স্বর্গগতা পত্নীর ও কন্যার স্মৃতি নিয়ে রচিত। বেদনার সরল অনাড়ম্বর প্রকাশে কবিতাগুলি মর্মস্পর্শী হ'য়ে উঠেছে। অন্তরই অন্তরকে সত্য ক'রে স্পর্শ ক'রতে পারে, বাইরের সাজসজ্জা চমক লাগিয়ে দিতে পারে মাত্র।

'শ্মশানে সম্ভাষণ' কবিতায় কবি মৃত-প্রিয়াকে ব'লছেন—

"ওঠ ওঠ আর কেন   শ্মশান শয্যায় হেন
অযতনে ছাই-ভস্মে আছ ঘুমাইয়া?

আরো অভিমান কত ক'রেছ ত' অবিরত
—আবার ভুলিয়া গেছ কাঁদিয়া-হাসিয়া।
ওঠ দেবি, দয়াময়ি, দেবতা আমার,
প্রীতির প্রসন্ন মুখে লও সে উদার বুকে
ভুলে যাই সংসারের ঘৃণা-অত্যাচার,
ভুলে যাই অবহেলা পদাঘাতে ঠেলে ফেলা
আদরে মুছায়ে প্রিয়ে লও অশ্রুধার।”

'স্মৃতি-সঙ্গীতে' কবি লিখেছেন—

“আহা, গেল সে কোথায় ?
এই যে আছিল বুকে হাসিমাখা সোনামুখে
এই যে এখনো তার দাগ দেখা যায়।

* * *

দেখি যেন কাছে কাছে সে মূর্তি এখনো আছে,
নয়নে নয়নে যেন ভাসিয়া বেড়ায়।

* *

মলয় বাতাসে আসে চাঁদের কিরণে ভাসে,
ফুলের সুরভি শ্বাসে বুকে আসে যায় !”

জীবন ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন। শেষ প্রদীপটিও নিবে গেছে। তাই 'অন্ধকার'কে উদ্দেশ ক'রে কবি ব'লছেন—

“সেই মান অভিমান, তাহার পীরিতি !—
তোমারি, তোমারি চেয়ে গাঢ় অন্ধকার !
নিবিয়াছে চন্দ্রসূর্য, ডুবিয়াছে ক্ষিতি,
গ্রাসিয়াছে একেবারে সমস্ত সংসার।”

সঙ্গহীন জীবন আজ সহস্র অতীত স্মৃতির সাক্ষীমাত্র হ'য়ে আছে। যে কল্যাণীমূর্ত্তি সমস্ত দুঃখকষ্ট নীরবে স'য়ে তপ্তহৃদয়ে সুধাবর্ষণ ক'রেছিল, সে আজ বিধাতার ইঙ্গিতে কোথায় ভেসে গেছে! এমনি ক'রেই যদি ছেড়ে যা'বে, তবে কি প্রয়োজন ছিল মিলনের?

"তুমি, আর আমি দেবি, তুমি আর আমি—
প্রবল পদ্মার স্রোতে ভাসি দুই ফুল।
তুমি আর আমি দেবি, তুমি আর আমি—
মুহূর্ত মিশিয়াছিনু, বিধাতার ভুল।"

মুহূর্তের মিলন মাত্র। সে কোথায় ভেসে গেল! উদ্বেল প্রীতি, উচ্ছল অনুরাগ—কিছুই বেঁধে রাখতে পারল না। জীবন কি শুধু স্বপ্নের মতই ভেসে চ'লেছে? বোধ হয়, তা'ই।

"তুমি আর আমি দেবি, তুমি আর আমি—
আবার ভাসিয়া গেছি দূরে দুইজন
তুমি আর আমি দেবি, তুমি আর আমি—
তরঙ্গে ভাসিয়া ফিরি দুইটি স্বপন।"

সেই স্বপ্ন-প্রতিমা চোখের আড়ালে চ'লে গেছে। কিন্তু তবু তা'র স্মৃতি প্রতিক্ষণেই মানসপটে তা'র প্রতিচ্ছবি এঁকে তুলছে।

"বর্ষমান আঁখিমেঘে অশ্রু শতধারে
ইন্দ্রধনুরূপ ছায়া পড়ে কল্পনার!"

"সহস্র চিন্তার মধ্যে ক্ষুদ্র অবসরে" তা'রই মুখ মনে জাগে। বসন্ত-বাতাসে যেন তা'র মোহস্পর্শে "শ্লথ কলেবর শিহরিয়া ওঠে।"

* * *

সাত বৎসর পরে তিনি 'প্রেমদা'কে গ্রহণ ক'রেছিলেন। কিন্তু 'সারদা'কেও তিনি ভুলতে পারেননি। উভয়কেই হৃদয়ে ও কাব্যে স্থান দিয়েছেন।

নির্ভীকতার জন্য কত দুঃখই না কবিকে সইতে হ'য়েছে! একটি পত্রিকায় ভাওয়াল-রাজের নিন্দাসূচক একটি লেখা বা'র হয়। গোবিন্দচন্দ্রকে তা'র লেখক ব'লে সন্দেহ করা হয়। কবি স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হ'লেন। কন্যা মণিকুন্তলা সবেমাত্র স্বামিগৃহ থেকে পিতৃগৃহে বেড়াতে এসেছে। রাতারাতি বাড়ী ছেড়ে যেতে হ'বে, রাজার আদেশ। কন্যাকে পুনরায় তা'র স্বামিগৃহে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে রাত্রির অন্ধকারে গৃহহারা কবি জন্ম-পল্লী ত্যাগ ক'রে চ'ললেন। কতদিনের কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি-বিজড়িত কুটীর বনমর্মরে বেদনা জানাল, অশ্রু-সিক্ত নয়নে কবি বিদায় গ্রহণ ক'রলেন। 'চন্দন' গ্রন্থ-খানিতে তাঁ'র নির্বাসিত জীবনের দুঃখ-বেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

এই নির্বাসন তাঁ'র তেজস্বী হৃদয়কে উত্তেজিত ক'রে তুলল। তিনি তীব্র ব্যঙ্গময় কাব্য লিখলেন, 'মগের মুল্লুক'। তা' নিয়ে মামলা হ'য়েছিল, কিন্তু পরে সে মামলা ফেঁসে যায়।

* * *

'কস্তুরী' নামক গ্রন্থের 'অতুল' তাঁ'র একটী উৎকৃষ্ট কবিতা। ওটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। বর্ণনাগুণে কবিতাটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হ'য়েছে।

বালক অতুল বিধবা মায়ের একমাত্র সান্ত্বনা।

"স্বপনে হারায়ে যায়, জাগ্রতে সংশয়,
আপনারে অবিশ্বাস, আপনারে ভয়।"

এ-হেন অতুল মাকে ছেড়ে বিদেশে প'ড়তে চ'লল। কে জানত, এই তা'র শেষ যাওয়া? দামোদরের বুকে যখন সে নৌকায় উঠল, তখন বেলা শেষ হ'য়ে এসেছে; আকাশে মেঘ জমেছে।

"তৃতীয় প্রহর গত, শরতের বেলা,
কৃষ্ণকায় মহাসিংহ মেঘে করে খেলা,
রবির পরিধি লাল মাংসপিণ্ড প্রায়
এ উহার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে খায়।
কি বিশাল লম্ফ-ঝম্ফ বিশাল গর্জ্জন
বিকট ভ্রূকুটি-ভঙ্গে করে আক্রমণ।
পড়ি' তার প্রতিচ্ছায়া সলিল ধবলে
জাগিয়াছে জলসিংহ পাতালের তলে।"

নৌকায় অতুল বিদায়-ব্যথায় কেঁদে আকুল, মা-ও সাশ্রু-নেত্রে নৌকার দিকে চেয়ে আছেন।

"স্নেহময় সে চাহনি, সে বন্ধন হায়,
দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।"

বর্ণনার ভঙ্গী কত সহজ, কিন্তু কত তীব্র! হৃদয়ের আবেগই তা'কে এমন সত্য, স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী ক'রে তুলেছে। কলা-কৌশলের ভঙ্গী স্বতন্ত্র, তা' বিষয়কে আপাত-মধুর ক'রতে পারে, এমন প্রাণময় ক'রে তুলতে পারে না।

মাতাপুত্র কাঁদতে কাঁদতে পরস্পরের প্রতি চেয়ে রইলেন। কেবল জল আর জল! চোখের জলে সব ঝাপ্‌সা হ'য়ে গিয়েছে।

"সলিলে হয়েছে অন্ধ নয়নের পথ,
তরাসে হয়েছে অন্ধ দূর ভবিষ্যৎ।
উপরে আকাশ অন্ধ, নীচে অন্ধজল,
বুকের ভিতরে অন্ধ তমস কেবল।
এত অন্ধকারে দোঁহে বাড়াইল হাত
যোজন যোজন দূরে দু'জনে তফাৎ।"

পূজা এল, সকলেই বাড়ী ফিরেছে। অতুল ফেরেনি। আর ফিরবে না। সর্বত্র পূজার উৎসব, কেবল একটি গৃহ অন্ধকারে নিলীন। হাসি ম'রে গেছে, সে-গৃহ কেবল শোকময়। ক্রমে দশমীর রাত্রি এল। চাঁদ মেঘের অন্ধকারে ডুবে গেল।

"যেন কার ভবিষ্যের ভীষণ উদরে
তারকার স্বপ্নগুলি হাবুডুবু করে।"

চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে আসে। শ্মশানেও যেন স্তব্ধ শান্তি!

"ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল,
সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল,
অনন্ত শান্তির সুধা ভুঞ্জিছে সবাই
একটি মায়ের চোখে শুধু ঘুম নাই!
চিরদাহ জাগরণ মা'র বুকে দিয়া
ঘুম যায় চিতা-চুল্লী নিবিয়া নিবিয়া।"

ভোর হ'ল। মা তখনও জেগে। অভাগিনী পাগল হ'য়ে গিয়েছেন। সূর্যোদয়। মা দুই হাত মেলে সন্তানের উদ্দেশে ছুটে চ'লেছেন

"চীৎকারে 'অতুল মোর আসিতেছে ওই',
খুঁজিতে উড়িল কাক—'কই, কই, কই?'
মূরছিয়া ধরাতলে পড়িলা জননী
তুলিতে সহস্র কর মেলে দিনমণি।
শেফালি ঝরিল আগে, তারকা নিবিল
রজনী সজনী তার শোকে প্রাণ দিল।
দেখিল পাড়ার শেষে লোকজন জমি'
জননী-স্নেহের সেই বিজয়া-দশমী।"

প্রাণের আবেগ তাঁ'র কবিতায় সর্বত্র প্রাণসঞ্চার ক'রেছে। বাংলার বিচিত্র সৌন্দর্য ও সুখ-দুঃখের লীলা তাঁ'র কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। তা' যেমন সুন্দর, তেমনি অকৃত্রিম। 'ফুলরেণু' গ্রন্থের সমস্তই চতুর্দশপদী। স্বল্প পরিসরেও কবিতাগুলি রসপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। প্রিয়ার স্মৃতি ওর অধিকাংশের অবলম্বন। তা'র প্রত্যেকটি ভঙ্গী কবির মনে প্রত্যক্ষ হ'য়ে আছে। তা'র চুল শুকোনো, কাঁথা সেলাই, মান-অভিমান, অনুরোধ—কিছুই কবি ভুলতে পারেননি।

"পাঁচটি বছর আজ, আজো দেখি তারে,
অবিকৃত সেই মূর্তি—সেই রূপ-রাশি,
অধর দু'খানি ঢেউ লোহিত সাগরে,
সুধার জোয়ারে তার প্রাণ যায় ভাসি'।"

জীবনের রস তিনি আকণ্ঠ পান ক'রতে চেয়েছিলেন। প্রেম ও প্রকৃতির তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ পূজারী। অনেক আকাঙ্ক্ষাই তাঁ'র অতৃপ্ত র'য়ে গেছে, কিন্তু কবি-প্রাণ মরে নি।

মৃতা প্রিয়ার প্রতি অনেক স্থলে তাঁ'র অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু প্রেমকে তা'র মৃত্যুজয়ী মহিমায় কবি দেখেছেন। তাই ব'লেছেন—

"তাহার চরণ-রেণু, তাহার ছাওয়ায়—
মরণ মরিয়া যায়, কহে দেবতায়।"

'শ্মশানে নিশান' কবিতাটি তাঁ'র কাব্য-মধ্যে একটি নূতন সুর ধ্বনিত ক'রেছে। শ্মশানে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের রূপ-কল্পনায় কবি মহাকাব্যের গাম্ভীর্য ও মহিমা প্রকাশ ক'রেছেন।

বর্ষার প্রলয়ঙ্করী সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

"নয়নে কালাগ্নি ঢালি' উন্মত্তা শ্মশানকালী
ধাইছে রাক্ষসী সন্ধ্যা মূর্তি তাড়কার!
উড়িছে মেঘের কোলে বলাকা উজালা,
ভৈরবীর কালকণ্ঠে মহাশঙ্খ-মালা।

দিগন্ত-বিস্তৃত ছায়ায় সকলই আচ্ছন্ন। ভয়ে ব্রহ্মপুত্র মসী হ'য়ে গেছে। আকাশে চন্দ্র-তারকার চিহ্ন নেই।

"হেন ঘোর অন্ধকারে—এ-হেন সময়,
উড়িছে শ্মশানে এক ধবল নিশান!
অর্ধদগ্ধ বংশদণ্ড, ছিন্নভিন্ন লণ্ডভণ্ড,
এখানে-ওখানে প'ড়ে শয্যা উপাধান!
'শ্মশানে নিশান কেন?' হাসে খলখল,
মড়ার মাথার খুলি, বিকাশিয়া দন্তগুলি,
বিকট বিশুষ্ক শুভ্র দীঘল দীঘল!
সবে করে উপহাস, ছাই-পাঁশ কাঁচা-বাঁশ
বিছানা কলসী দড়ি মিলিয়া সকল!
কি যে সে বিকট হাসি হাসে খলখল!"

কিছুক্ষণ পরে মেঘ লঘু হ'য়ে এল। অকস্মাৎ চন্দ্রের আভায় চিতা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। কবি দেখলেন, "ধবল বৃষভ'পর বিরাজিত বিশ্বম্ভর, ধবল অস্থির মালা গলে দলমল"—মৃত্যুঞ্জয় নিশান ধারণ ক'রে শ্মশানেশ্বর শ্মশানে আবির্ভূত! তাঁ'র উদাত্তকণ্ঠে 'মরণমঙ্গল' ধ্বনিত হ'চ্ছে। বিশ্ব সেই মহাসঙ্গীতে কণ্ঠ মেলাল। ত্রিলোকের সেই মহাপরিণাম সর্ব্বত্র ঘোষিত হ'তে লাগল।

বাংলার ও বাঙালীর এই অমর কবিকে আমরা আজ ভুলতে ব'সেছি। বৈদেশিক কবিগণের চর্বিত-চর্বণকে যদি আমরা এই

মৌলিক প্রতিভার দান অপেক্ষা অধিকতর সম্মান দেখাই, তবে তা'তে আমাদের বিচার ক'রবার অক্ষমতাই প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ, বাংলাকে ভালোবাসলে এই খাঁটি বাঙালী কবিকে আমরা অবহেলা ক'রতে পারব না। তাঁ'র কবিতাকে ভালোবাসলে আমরা বাঙলাকে আরও নিবিড়ভাবে ভালোবাসব। বাংলার পথ-ঘাট, বন-জঙ্গল, নদী ও বিল তাঁ'র কাব্যে ছবির মত সুন্দরভাবে আঁকা হ'য়ে আছে। আকাশের এক চাঁদ বিলের বুকে হাজারখানা হ'য়ে ভাসছে —"ঘাসের ছায়ার গায় কুমুদী হারায়ে যায়, সাঁতারিয়া শশী যেন খুঁজিছে অনেক"; আবার "শুয়ে থাকে সন্ধ্যারাতে কৌমুদী কুমুদ-পাতে, ঝোপে-ঝাপে ধানক্ষেতে ঠিক্ নাই এক",—এমনি অনেক চিত্র তিনি সুনিপুণ তুলিকায় এঁকে রেখে গেছেন। আশা করি, সে-কাব্যসম্পদকে আমরা এমন হেলায় হারাব না।

তাঁ'র কবিতা কোথাও পরের অনুকরণ বা কাল্পনিক সুখ-দুঃখের অস্পষ্ট চিত্র নয়, জীবন-সরোবরে তা' পদ্মের মত ফুটে উঠেছে; যে আনন্দবেদনা প্রকৃতই কবির অন্তরকে আলোড়িত ক'রেছে, কবিতা-গুলি তা'রই প্রকাশ, তাই তাঁ'র বর্ণনা-ভঙ্গী এমন সজীব ও নূতন। তাঁ'র অলঙ্কারের প্রয়োগেও দেখতে পাই, তা' পুঁথির পাতা থেকে ধার করা নয়, স্বভাব থেকে চয়ন-করা। হৃদয়াবেগে যেন তা' আপনিই এসে প'ড়েছে।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি রবীন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি কয়েকজন সাহিত্যিকের নিকট থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। কিন্তু আঘাতে আঘাতে তাঁ'র হৃদয় ভেঙে গিয়েছিল। নিঃশব্দে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। প্রজাপতির পাখার ভরে সাধারণের দৃষ্টি-অগোচরে বনফুল নীরবে ধূলোয় ঝ'রে গেল। বনফুলের খোঁজ কেই-বা রাখে!

[উদয়ন, কার্তিক, ১৩৪১]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(১৮৮২—১৯২২)

১

রবীন্দ্র-অনুবর্তী কবিদের মধ্যে সব-চেয়ে জনপ্রিয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁ'র জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ তাঁ'র বিচিত্র ছন্দোঝঙ্কার। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে প্রগাঢ় ভাবুকতা ও দার্শনিকতার সাক্ষাৎ পাই, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় তা' নেই। কিন্তু অনেক স্থলেই তাঁ'র কবিতার কোমল শব্দমাধুর্য এবং ছন্দের নৃত্যবিলাস আমাদের মুগ্ধ করে।

চিত্র, সঙ্গীত, ভাবুকতা—এই তিনের গুণ এক হয় ভালো কবিতায়। তবে তিনটির পূর্ণ সামঞ্জস্য সুলভ নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটির বা দুইটির প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কোনও লেখা চিত্রপ্রধান, কোনটি সঙ্গীতপ্রধান, কোনটি বা হয় ভাবপ্রধান।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় চিত্র ও সঙ্গীতের প্রাধান্য। জীবনের গভীর সমস্যাগুলি দু'এক সময়ে তাঁ'র মনকে হাল্‌কাভাবে ছুঁয়ে গেলেও তাঁ'কে আকুল ক'রে তোলেনি। সমসাময়িক ঘটনাবলী তাঁ'র মনে ঢেউ তুলেছে বটে, কিন্তু জীবন-রহস্যের কলকল্লোল জাগায়নি।

ভাব-গভীরতার এই বিরলতা-সত্ত্বেও বঙ্গসাহিত্যে তাঁ'র দান স্মরণীয়। যে বিস্ময়-রসে কবিতার জন্ম, সেই বিস্ময়-রস তাঁ'র কবিতায় সুপ্রচুর। শিশুর মত কৌতূহলী দৃষ্টিতে তিনি জগতের পানে চেয়েছেন,

যা' দেখেছেন, তা'তেই মুগ্ধ হ'য়েছেন। কবি-মনের এই এক বিশিষ্ট ভঙ্গী। অপূর্ব আনন্দে তিনি চরকার ঘর্ঘর শব্দে কান পেতেছেন, পিয়ানোর টুং টাং শুনে মুগ্ধ হ'য়েছেন, শীতের ভোরে সোল্লাসে 'তাতারসির গান' গেয়েছেন, আবার মাঝিদের 'দূরের পাল্লা' দেখতে দেখতে তন্ময় হ'য়ে গিয়েছেন। জীবনের প্রতিটি সামান্য জিনিষের মধ্যে তিনি দেখেছেন চিত্র-রূপ, শুনেছেন সঙ্গীতের সুর, হ'য়েছেন আনন্দে বিভোর। এ আনন্দ কোনও তত্ত্বোপলব্ধির নয়, রূপপ্রিয়ের সহজ সরল আনন্দ।

২

সকল শিল্পীরই চোখে মাখানো থাকে বিস্ময়ের অঞ্জন। কেউ মানব-মনের রহস্যে, কেউ প্রকৃতির সৌন্দর্যে, কেউ অতীন্দ্রিয়ের ধ্যানে, কেউবা অলৌকিক কল্পনায় এই বিস্ময় প্রকাশ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ সহজ সৌন্দর্যের ভক্ত, সরল কল্পনার পূজারী। শিশুর রূপচপল মন নিয়ে উৎসুক দৃষ্টি মেলে' তিনি ঘুরে' বেড়িয়েছেন মাঠে, ঘাটে, পাহাড়ে, বনে; গভীর চিন্তায় বা গুরু সমস্যায় মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলেন নি। তাঁ'র ভাষায়ও কলকাকলীর প্রগল্‌ভ মাধুর্য। মনের আনন্দে কথার পর কথা সাজিয়ে চ'লেছেন তিনি, হিসেব ক'রে ভাষাকে কঠিন বাঁধনে বেঁধে ফেলেননি।

৩

এই শিশু-মনই তাঁকে টেনে নিয়েছে রূপকথার স্বপ্নপথে। পরী-রাজ্যের মোহ ও বিচিত্র অপার্থিব রহস্য তাঁ'কে মায়ামন্ত্রে আকৃষ্ট

ক'রেছে। 'সবুজ পরী', 'লাল পরী', 'জর্দা পরী', 'বিদ্যুৎপর্ণা' প্রভৃতি পরীর দল পথ ভুলিয়ে নিয়ে গেছে তাঁ'কে কোন্ চির-জ্যোৎস্নার দেশে। তাঁ'র এই স্বপ্নমুগ্ধ দৃষ্টি কীট্‌সের কথা মনে আনে; বোধ হয়, বিশেষ ক'রে ইয়েট্‌স্‌কে স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয়, ইয়েট্‌সের সঙ্গে তাঁর কবি-মনের কতকটা সাধর্ম্য আছে। ইয়েট্‌স্ যেমন আয়ারল্যাণ্ডের প্রাচীন গাথা ও কাহিনীর অনুরাগী, সত্যেন্দ্রনাথও তেমনি বাংলাদেশের প্রাচীন রূপকথা, ব্রতকথা, ছড়া ও গাথার পরম ভক্ত। রূপকথা, ব্রতকথার ইন্দ্রজাল অনেক কবিতাতেই ব্যাপ্ত। 'কুহু ও কেকা'র 'দার্জিলিঙে' কবিতায়:

"হঠাৎ এলো কুজ্ঝটিকা হাওয়ায় চড়িয়া,
ঘুম-পাহাড়ের বুড়ী দিল মন্ত্র পড়িয়া"

ছত্র-দু'টিতে কোন্ ডাইনী বুড়ীর মায়ামন্ত্রে অপূর্ব রহস্য-কুহেলিকা ঘনিয়ে এসেছে। আবার, 'বিদায়-আরতি'র 'দূরের পাল্লা'য়:

"হাড় বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামরচুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে,
লোক দেখে কি থম্‌কে গেল?
জমজমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এলো, রাত্রি এলো!"

এখানেও খেজুর গাছের সঙ্গে ঝামরচুলো ডাইনীর উপমায় এক দিকে যেমন ছবিটি স্পষ্ট হ'য়ে ফুটেছে, অন্যদিকে তেমনি অজানা দেশে সন্ধ্যাসমাগমে মাঝিদের মনে উদ্বেগ-মিশ্রিত আশঙ্কা, চা'রদিকের অদ্ভুত থমথমে' ভাব রহস্যছায়া ঘনিয়ে তুলেছে।

পুণ্যবতীর স্পর্শে আবদ্ধ নৌকা আবার জলে ভাসে, বাংলার ব্রত-কথায় এমন ঘটনার উল্লেখ আছে। সত্যেন্দ্রনাথের 'কিশোরী', 'দূরের পাল্লা' প্রভৃতি কবিতায় এই সব গল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট।

বাংলার কিশোরী কবির কল্পলোকের রাণী।

"ওই সদাগরের বোঝাই ডিঙা
ফিঙার মত' চ'লত উড়ে'
তা'র পরশ-লোভে আজকে সে হায়
দাঁড়িয়ে আছে ঘাটটি জুড়ে'।

অরাজকের পাগলা হাতী
পথে পথে ফিরছে মাতি
তা'রে দেখতে পেলেই ক'রবে রাণী,
শুঁড়ে তুলে' তুলবে মুড়ে'
ওগো তা'রই লাগি' বাজছে বাঁশী
পরাণ ব্যেপে ভুবন জুড়ে'।" (কিশোরী)

'দূরের পাল্লা'য় মাঝিরা নৌকা বেয়ে চলেছে। পল্লীকিশোরীর রূপের গানে দুই কূল মুখরিত।

"দুই তীরে গ্রামগুলি
ওর জয়ই গাইছে,
গঞ্জে যে নৌকো সে
ওর মুখই চাইছে।
আটকেছে যেই ডিঙা
চাইছে সে স্পর্শ
সঙ্কটে শক্তি ও
সংসারে হর্ষ।" (দূরের পাল্লা)

৪

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দোঝঙ্কারের কথাই অনেকে উল্লেখ ক'রে থাকেন, কিন্তু তাঁ'র কবিতার গীতিমাধুর্য অপেক্ষা চিত্র-সম্পদ্ কিছুমাত্র নগণ্য নয়। বাংলার রূপ তাঁ'র রচনায় মূর্তি ধ'রে দেখা দিয়েছে।

"ঘোর ঘোর সন্ধ্যায়
ঝাউগাছ দুলছে,
ঢোল্-কলমীর ফুল
তন্দ্রায় ঢুলছে।
লক লক শর-বন
বক তায় মগ্ন,
চুপচাপ চা'রদিক
সন্ধ্যার লগ্ন।"

......রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে। ডাক-পেয়াদা অন্ধকারে মাঠ পাড়ি দিচ্ছে।

"আলেয়া-হেন ডাক-পেয়াদা
আলেয়া হ'তে ধায় জেয়াদা
একলা ছোটে বন-বাদাড়ে
ল্যাম্পো হাতে লকৃড়ি ঘাড়ে।"

.........গভীর রাত্রি। গ্রাম ঘুমে অচেতন। সংকীর্ণ নদীপথে মাঝিরা চলেছে।

"বাঁশের ঝোপে জাগছে সাড়া,
কোলকুঁজো বাঁশ হ'চ্ছে খাড়া,
জাগছে হাওয়া জলের ধারে,
চাঁদ ওঠেনি আজ আঁধারে।"

এম্‌নি অসংখ্য ছবি তিনি এঁকেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বাংলার কবি, বাঙালীর কবি। তাঁ'র কাব্যলক্ষ্মী যেন বাংলার পল্লী-কিশোরীর মত। নবনীতকোমল স্নেহ এবং সরল কৌতূহল তা'র অন্তর পূর্ণ ক'রে রেখেছে। ব্রতপুরাণ জীবনকে ক'রেছে মধুময়; সরল গীতিস্থর জাগছে কণ্ঠে; হ্রী এবং শ্রী সর্বাঙ্গে সঞ্চার ক'রেছে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য; মুখে বিকশিত পুণ্যপ্রভা।

তাঁ'র কবিতার দেহে মনে ব্যাপ্ত এই প্রাণজুড়ানো বাঙালীত্ব। উপমাগুলিতেও তা'র প্রমাণ পাই। গতানুগতিক উপমা তাঁ'র কাব্যে কম। বাংলার পথে ঘাটে যে সুন্দর জিনিষগুলি আমাদের প্রতিদিন চোখে পড়ে, তা' থেকেই তিনি উপমার সামগ্রী বেছে নিয়েছেন। শরতের রাঙা আলো মেঘের মধ্য থেকে ফুটে বেরিয়েছে। কবি বর্ণনা ক'রছেন:

"কালো মেঘের কোলটি জুড়ে' আলো আবার চোখ চেয়েছে।
মিশির জমি জমিয়ে ঠোঁটে শরৎরাণী পান খেয়েছে!"

......গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে দীঘির জল ঝাপ্‌সা হ'য়ে গেছে। মনে হ'চ্ছে:

"দীঘির জলে কোন্ পোটো আজ আঁশ ফেলে কি নক্‌শা দেখে,
শোল্‌-পোনাদের তরুণ পিঠে আল্‌পনা সে যাচ্ছে এঁকে!"

......বৃষ্টি বেড়ে চলে।

"ডালপালাতে বৃষ্টি পড়ে, শব্দ বাড়ে ঘড়িক্ ঘড়ি—
লক্ষ্মীদেবীর সাম্‌নে কা'রা হাজার হাতে খেলছে কড়ি।"

(চিত্রশরৎ)

......ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টি চ'লেছে। মেঘের কিনারে কিনারে রোদের রেখা। কবি উপমা দিচ্ছেন:

"মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে—আলুতাপাটি শিম।" (ইলুশেগুঁড়ি)

৫

শুধু বাংলার নয়, দেশ-বিদেশের নানাস্থানের প্রাকৃতিক চিত্র তিনি তাঁ'র কবিতায় এঁকেছেন। একদিকে যেমন তিনি মনে-প্রাণে বাঙালী, বাংলার রূপে-রসে বিভোর, অন্যদিকে তেমনি সারা জগতের সৌন্দর্য ও ভাব-কল্পনার অনুরক্ত উপাসক।

'ঘুমতী নদী', 'সিঙ্গলে স্থর্যোদয়', 'জাফ্রানিস্থান' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বর্ণনাত্মক কবিতা। কবির চিত্রণ-নৈপুণ্য অসাধারণ। আর, আঁকবার ভঙ্গী তাঁ'র সম্পূর্ণ নিজস্ব, তা'তে কারও অনুকরণের চিহ্ন নেই।

......'বিদ্যুৎপর্ণা'য় কবি পরীর ছবি এঁকেছেন।

"মেঘের ওপিঠে শুয়ে
ধরণীরে দেখি হুয়ে।"

দু'টি আঁচড়ে অপরূপ মেঘলোকের পরীর ছবি।

......আলোয় আলোয় চা'রদিক্ ভ'রে গেছে। শাদা মেঘে আজ শঙ্খচিলের ডানা মিলায়।

"জর্দাকাঠির গন্ধ জেতে ময়না জেগে স্বপ্ন দেখে,
শিউলি ফুলি হাওয়ায় ভেসে ঘাসের ফুলে ফড়িং ঠেকে।

* * *

জলের তালে দুলছে মাঝি বাঁধা নায়ের দুই-তলাতে
টুনটুনি থায় একলা কেবল করমচা-ডাল টলমলাতে।

* * *

দুর কিনারায় পাঁজর-খোলা মেরামতের নৌকাখানা
প'ড়ে প'ড়ে স্বপ্ন দেখে বন্যাদিনের প্রলয়-হানা।"

(আলোর পাথার)

……'সিঞ্চলে' সূর্যোদয়-কাল। "বিভাবরীর নীলাম্বরীর আঁচল ওঠে মোতির আভায় ভিজে'।"

"পাশ মোড়া দেয় স্বপ্নে উষা আধখোলা চোখ আধফোটা ফুল পারা,
সোনামুখের ছাই লেগে হয় মুহুর্মুহু আকাশ আপনহারা।"

……নির্জন গিরি-পথে চ'লেছে ঝর্ণা, উপলে উপলে বাজে সুর।

"শিথিল সব শিলার 'পর
চরণ থুই দোদুল মন,
দুপুর-ভোর ঝিঁঝির ডাক
ঝিমায় পথ, ঘুমায় বন।
বিজন দেশ, কূজন নাই,
নিজের পায় বাজাই তাল,
একলা গাই, একলা ধাই
দিবস-রাত সাঁঝ-সকাল।
ঝুঁকিয়ে ঘাড় ঝুম-পাহাড়
ভয় দেখায়, চোখ পাকায়,
শঙ্কা নাই, সমান যাই
টগরফুল নূপুর পায়।"

এম্‌নি ক'রে আপন মনে নেচে চ'লেছে নর্তকী ঝর্ণা। এ কবিতায় চিত্র ও ঝঙ্কার একসাথে সুন্দর মিলেছে। শব্দগুলিতে 'ল'-এর ধ্বনি নুড়ি আর জলের টল্‌টলে আওয়াজটি পর্যন্ত বাজিয়ে তুলেছে।

৬

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দঃ-সম্পদের কথা অনেকেই আলোচনা ক'রেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এমন অবলীলাক্রমে নবনব ছন্দের অবতারণা ক'রতে

আর কাউকে দেখা যায়নি। ছন্দঃ বিষয়ের উপযোগী হ'য়েছে ব'লেই এত মনোরম।

'ঝর্ণা' কবিতায়ঃ

"ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা চন্দনবর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে
গিরিমল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে
তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
—ঝর্ণা!"

ছন্দের নর্তনে ঝর্ণার সুললিত নূপুর-ঝঙ্কার অনুরণিত হ'য়েছে।

বর্ষার বর্ণনায়ঃ

"ঝরছে ঝর্ঝর, ঝরছে ঝম্‌ঝম্‌
বজ্র গর্জায়, ঝঞ্ঝা গম্‌গম্‌,
লিখ্‌ছে বিদ্যুৎ মন্ত্র অদ্ভুত,
বল্‌ছে তিন লোক বম্‌ ববম্‌ বম্‌।" (ছন্দ-হিন্দোল)

অন্যান্য ভাষার ছন্দগুলি বাংলায় প্রবর্তন ক'রতে গিয়ে কবি বাংলার নিজস্ব উচ্চারণরীতিকে উপেক্ষা করেননি। সংস্কৃতের হ্রস্বদীর্ঘ স্বর-তরঙ্গকে তিনি বাংলার স্বাভাবিক মাত্রাসংখ্যা বাড়িয়ে কমিয়ে প্রকাশ ক'রেছেন।

যথা, 'মালিনী' ছন্দ :—

"উড়ে চ'লে গেছে বুল্‌বুল্‌
স্বর্ণময় শূন্য পিঞ্জর
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।"

......'শার্দূল-বিক্রীড়িত' ছন্দ :—

"সিন্ধুর রোল
মেঘে ভিড়ল আজ
গরজে বাজ
বিদ্যুৎ বিলোল
রক্ত চোখ।"

......'মন্দাক্রান্তা' ছন্দ :—

"পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ, উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি' আজ মন্দ্র মন্থর বচন কও।"

৭

সমসাময়িক ঘটনাপ্রগতির প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের সাগ্রহ দৃষ্টি ছিল এবং তা' নিয়ে তিনি অনেক কবিতাও রচনা ক'রেছেন। কবিত্ব-সৌন্দর্যের চেয়ে তাঁ'র মনের সচেতনতা এবং আদর্শপ্রীতিই সেগুলিতে বেশী পরিস্ফুট।

ইতিহাসের তিনি ছিলেন অনুরাগী পাঠক। তাঁ'র ঐতিহাসিক উপন্যাস 'ডঙ্কা-নিশান' তা'র প্রধান নিদর্শন। কবিতাতেও অনেক স্থলেই তাঁ'র ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গের বন্দনা গাইতে গিয়ে 'গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি', 'আমরা' প্রভৃতি কবিতায় তিনি স্বদেশের বহু কীর্তিকথার উল্লেখ ক'রেছেন। 'দিল্লীনামা'য় ঐ নগরীর, তথা ভারতবর্ষের যুগযুগান্তরের গৌরব-স্মৃতি বর্ণিত হ'য়েছে। কবিতাটির অনেকস্থান মনোরম কবিত্বমণ্ডিত। এই নিষ্ঠুরা পাষাণী যুগেযুগে অসংখ্য রাজ্যলিপ্সুর শোচনীয় পরিণাম নিষ্করুণ নেত্রে তাকিয়ে দেখেছে।

"হাজার হাজার বীরের রুধিরে
আঁকিয়াছ ভালে রক্তটীকা
গড়-কেল্লার কঙ্কালজালে
সাজিয়াছ আজ তুমি কালিকা।"

দিল্লীর অতীত গৌরব আজ অস্তমিত। অসংখ্য কীর্তির ধ্বংসাবশেষ তা'র পদতলে লুণ্ঠিত।

"কত অতিকায় কামনার কায়া
কঙ্কালসার পড়িয়া আছে,
অতীত যুগের শিলাপঞ্জর
পাষাণি গো, তোর পায়ের কাছে।"

'সরযূ' আর একটি সুন্দর ঐতিহাসিক-স্মৃতিজড়িত কবিতা। রঘুকুলের এই রাজলক্ষ্মী 'বিস্মরণের ভস্মমাঝে' বিলাপের গান গেয়ে চ'লেছেন। আজও তাঁ'র অঙ্গে চন্দ্রমালার জ্যোতিঃ, অতীতের স্বপ্নে তাঁ'র মন বিভোর। হরধনুভঙ্গকারী রামচন্দ্র আজ তাঁ'র বক্ষে সুপ্ত।

"যাত্রী এসে দেশবিদেশের তোর তীরে তাঁ'র চরণচিহ্ন খোঁজে
চোখের জলে ঝাপ্‌সা দু'চোখ খোঁজে সীতার রাঙা পায়ের রেখা।"

ভিড়ের কোলাহলে অতীতের স্বপ্ন ভেঙে যায়। মন চমকে ওঠে। সরযূর সন্তানেরা আজ 'সুদূর মরীচ শহরে' কুলিগিরি ক'রতে চ'লেছে 'ঘরে ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ' নিবে যায়, কন্যাজায়ার ক্রন্দনে আকাশ আকুল হ'য়ে ওঠে।

৮

মানবমহিমার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ কবি সর্বমানবের সাম্যের গান গেয়েছেন। তাঁ'র প্রথম দিকের রচনা 'হোমশিখা' গ্রন্থের 'সাম্যসাম'

কবিতায় সে গান আবেগ-উচ্ছ্বসিত। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের বন্দনা তাঁ'র ঔদার্যের পরিচায়ক। 'বুদ্ধবরণ' এই পর্যায়ের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। গান্ধীজী, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, তিলক, ম্যাক্‌স্যুইনি,, ডেভিড হেয়ার, নফরকুণ্ডু, হরিনাথ দে সকলেই তাঁ'র শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ ক'রেছেন। আধুনিক খ্রীষ্টানগণ দেবাত্মা যীশু-খ্রীষ্টের ধর্ম ভুলে গিয়েছেন, এজন্য 'বড়দিনে' কবিতায় তিনি আক্ষেপ ক'রেছেন।

রাজনৈতিক পরাধীনতা, সামাজিক অবিচার, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার কবির প্রাণে আঘাত ক'রেছে; অনেকস্থলেই সে বেদনা কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। 'ফরিয়াদ', 'ইজ্জতের জন্য', মৃত্যু স্বয়ম্বর' প্রভৃতি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্যায়কে তিনি কোথাও ক্ষমা করেন নি, তা'র প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ ক'রেছেন। তাই তাঁ'র মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> "অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
> কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তা'র পরে তব অভিশাপ
> বর্ষিয়াছে ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণসম।"

৯

তাঁ'র দেশানুরাগ কেবলমাত্র রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই আত্ম-প্রকাশ করেনি। দেশের সকল স্মৃতি ও মাধুরী তিনি আপন ক'রে নিয়েছিলেন। এর সৌন্দর্য ও গৌরব সত্যই তাঁ'র অন্তরকে গভীর ভাবে স্পর্শ ক'রত।

জাতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে তিনি নূতন ক'রে লিখতে আরম্ভ ক'রেছিলেন। কবিতা-হিসেবে সবগুলি সার্থক না হ'লেও

নূতন প্রচেষ্টা-হিসেবে এগুলি লক্ষ্য ক'রবার বস্তু। অবশ্য তাঁ'র পূর্বে পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দু'একটি নাট্যকবিতা রচনা ক'রেছেন। কিন্তু 'ভীমজননী', 'কয়াধু', 'স্কন্দধাত্রী', 'গিরিরাণী' প্রভৃতি প্রভৃতি কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনারীতি মৌলিক এবং অভিনব।

"পাখীর ডাকা ঘুমিয়ে গেল, ঝিঁঝিঁর ডাকা ঝিমিয়ে জাগে,
ডালপালাতে অন্ধকারের অন্ধ হাওয়ার উছট লাগে।"

(ভীমজননী)

সুন্দর প্রাকৃতিক চিত্র! আবার 'গিরিরাণী' কবিতায়ঃ

"আকাশ জুড়ে' বিপুল-বপু উড়ল পাহাড় ক্রোর
ধরায় উপগ্রহের মালা উল্কাহেন ঘোর।
অন্ধ ক'রে সূর্য ওড়ে বিন্ধ্য বসুমান্
ধবলগিরির ধবলিমায় চন্দ্রমা সে ম্লান।
তীর বেগে ধায় ক্রৌঞ্চ পাহাড় ক্রৌঞ্চকুলের সাধ
নীলগিরি নীলকান্ত মণির নির্মিত ঠিক চাঁদ;
উদয়গিরি অস্তগিরি উড়ল একত্তর
মাল্যবান্ আর মলয়গিরি ছায় নভ-চত্তর,
চন্দ্রশেখর সঙ্গে মহা মহেন্দ্র পর্বত—
লোমকূপে লাখ ঋষি নিয়ে উড়ল যুগপৎ।
সবার আগে চল্‌ল বেগে শৈল যুবরাজ
মৈনাক মোর ফেলতে মুছে শৈলকুলের লাজ।"

পাহাড়দের যুদ্ধের এই চিত্রে গল্পবর্ণনার সুন্দর সহজ ভঙ্গী এবং ঘটনার উপযোগী ছন্দের দ্রুতি ও ভাষার শক্তি কবির বিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক।

১০

অনুবাদ-নৈপুণ্যের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। 'তীর্থসলিল', তীর্থরেণু' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের অতুলন সম্পদ্। তাঁ'র অনুবাদ যেমন মূলানুগত, তেমনি ভাবদীপ্ত ও স্বাবলীল। 'ওহাক্ল', 'নিষ্ঠুরা সুন্দরী', মৃত্যুরূপা মাতা' প্রভৃতি তাঁ'র কৃতিত্বের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। শেষোক্তটি স্বামী বিবেকানন্দের 'Kali the Mother' নামক ইংরেজী কবিতার অনুবাদ। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা সাধারণতঃ কোমল; কিন্তু এ অনুবাদে তিনি মূলের গাম্ভীর্য ও মহিমা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

"The stars are all blotted out,
Clouds are covering clouds"

"নিঃশেষে নিবেছে তারাদল,
মেঘ এসে আবরিছে মেঘ"

মূল ও অনুবাদ পাশাপাশি রেখে পড়লেই অনুবাদকের কৃতিত্ব অনায়াসে হৃদয়গত হ'বে।

১১

সত্যেন্দ্রনাথ সুনিপুণ শব্দশিল্পী। বিভিন্ন বিষয়ের উপযোগী শব্দে ও ছন্দে তাঁ'র রচনা সমৃদ্ধ। কি 'হসন্তিকা'র হাসির কবিতায়, কি 'অভ্র-আবীর', 'ফুলের ফসলে'র স্বপ্নময় চিত্রে—সর্বত্রই তাঁর নৈপুণ্য সুপ্রকাশ। বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে 'হোমশিখা'র ভাষা একটু সংস্কৃত-মূলক। পরবর্তী সব কাব্যেরই ভাষা সহজ, সরল। যে-সকল শব্দ মুখেমুখে প্রচলিত, সাহিত্যে সচরাচর উপেক্ষিত, এমন বহু শব্দে তিনি তাঁর কাব্যলক্ষ্মীকে সুন্দর ক'রে সাজিয়েছেন। অকৃত্রিম লাবণ্যে

সেগুলি শোভা পেয়েছে। দেশকে কতদিক্ থেকে কতভাবে তিনি জানবার ও চেনবার চেষ্টা ক'রেছেন, তাঁ'র শব্দ ভাণ্ডারের দিকে লক্ষ্য ক'রলেও বোঝা যায়। বিদেশী শব্দও তিনি অনেক আহরণ ক'রেছেন এবং নিপুণভাবে প্রয়োগ ক'রেছেন তাঁ'র কবিতায়।

তাঁ'র প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বড় কবির মোহে প'ড়ে তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য হারাননি। নিজ প্রকৃতির অনুবর্তী হ'য়েই তিনি চ'লেছেন এবং সেই জন্যেই সিদ্ধিলাভ ক'রেছেন। তাঁ'র কাব্য স্বপ্নলোকের ভাণ্ডার, মনোরম চিত্রশালা, ইন্দ্রজালের রাজ্য। সেখানে প্রবেশ ক'রলেই মুগ্ধ হতে হয়। ধ্যানতন্ময়তার অবকাশ সেখানে নেই, আছে শুধু রঙের উপর রং, মোহের উপর মোহ,—নানাবর্ণের সন্ধ্যামেঘের খেলা। সেখানে পরীর গান, মন্ত্রের মায়া। সে শুধু কল্পনার পাখা মেলে উড়ে যাবার দেশ। জীবনের সুখদুঃখ সেখানে দূর থেকে কোমল সুরে ভেসে আসে, 'স্মৃতি-যাদুঘরে' ঘনায় রহস্যছায়া।

ছোট গল্প

পাশ্চাত্ত্য দেশে ছোট গল্প খুবই জনপ্রিয়। আমাদের দেশেও এর আদর ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। আমাদের ক্ষুদ্র সুখদুঃখময় বৈচিত্র্য-বিরল জীবন ছোটগল্পেরই প্রকৃত উপাদান জোগাতে পারে। বৃহৎ উপন্যাসের উপযোগী বৃহৎ ঘটনাবলী আমাদের জীবনে একান্তই দুর্লভ।

উপন্যাস এবং ছোটগল্পের ভঙ্গী পৃথক্। ছোটগল্প উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার নয়, উপন্যাসও ছোটগল্পের বিস্তারমাত্র নয়। উপন্যাস সুবৃহৎ পটে জটিল ও বিচিত্র সংসারকে বৃহৎভাবে এঁকে তুলতে চায়। জীবন-যাত্রার কত না কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্রের কত না ঘাতপ্রতিঘাত উপন্যাসের পাতায় পাতায় রস-সঞ্চার ক'রতে থাকে। তা'তে বৈচিত্র্যের সমাবেশ আছে—বিচিত্র ভাবের, বিচিত্র রসের। কিন্তু ছোটগল্পে এই বৈচিত্র্যের সমাবেশ তেমন সম্ভব নয়। জীবনের একটি কোণ বিচ্ছিন্নভাবে লেখকের কল্পনা-দৃষ্টিতে আলোকিত হ'য়ে ওঠে, আর তা'রই মধ্যে যেন একটি সমগ্রতার আভাস ফুটে ওঠে।

ছোটগল্পের আখ্যানবিন্যাসে সূক্ষ্ম শিল্পবোধের প্রয়োজন। জীবনের এমন একটি অংশ বেছে নেওয়া উচিত যাতে সে-টি আপনাতে-আপনি সম্পূর্ণ ব'লে বোধ হয়। এই সম্পূর্ণতার বোধ বর্ণনানৈপুণ্যের উপরে, গল্প-সাজানোর উপরে বিশেষরূপে নির্ভর করে। সকল বাহুল্য বর্জন ক'রে আনতে হ'বে সংহত আকার। একটি অনুভূতি বা উপলব্ধির অভিমুখে বর্ণনীয় ঘটনাকে অগ্রসর ক'রে দিতে হ'বে

তীব্রবেগে। উপন্যাসের মত' বিচিত্র ঘটনা ও দৃশ্যের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'বার সুযোগ এতে নেই। ইদানীং উপন্যাস ক্রমেই হ'য়ে উঠছে বিশ্লেষণ-প্রবণ। ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের অবকাশ মেলেনা। কোনও চরিত্রের একটি বিশেষত্ব অথবা বিশেষ ঘটনাসংস্থানের মধ্য দিয়ে একটি ভাব ফুটিয়ে তোলাই প্রায়শঃ ছোটগল্প-লেখকের উদ্দেশ্য।

ঐক্যের বা সমগ্রতার বোধ ছোটগল্পে অপরিহার্য। উপন্যাসে কত চরিত্র, কত ঘটনার বিভিন্ন রকমের আকর্ষণ, কিন্তু এতে একটি রসবস্তুকেই নিবিড় ক'রে ঘনিয়ে তুলতে হয়। একটি খণ্ডচিত্রের মধ্যেই যেন জীবনের আভাস মেলে, যেমন আলোড়িত সমুদ্রের একটি তরঙ্গের মধ্যে আভাস মেলে সমুদ্রের। একটি মাত্র ভাবের অনুভূতিদীপ্ত প্রকাশ ব'লেই কেউ কেউ এর সঙ্গে তুলনা করেন গীতিকবিতার।

ছোটগল্পের নায়ক-নায়িকারা আমাদের কাছে আসে. চ'লে যায় ক্ষণিক অতিথির মত। দিনের পর দিন তা'দের বিচিত্ররূপ আমরা দেখতে পাইনা, তা'দের সমগ্র জীবন আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠেনা, অথচ ক্ষণকালেই কোনও স্মরণীয় পরিচয় পেয়ে আমরা আনন্দিত ও মুগ্ধ হ'য়ে যাই।

জীবনের রূপ বিচ্ছিন্নভাবে ধরা পড়ে এতে। পৃথিবীতেও ক'জনকেই বা আমরা অন্তরঙ্গ ক'রে জানবার সুযোগ পাই? জীবনের পথে অনেকের সঙ্গেই তো দু'দণ্ডের পরিচয়। দূরের যাত্রাপথে চ'লতে চ'লতে মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন দৃশ্য প'ড়ছে আমাদের চোখে। অথচ বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগুলিরও সৌন্দর্য উপেক্ষণীয় নয়, তারই মধ্যে ঝ'লকে উঠছে চিরন্তন রহস্যের দীপ্তি। ছোটগল্পে পাই এই ক্ষণেকের দেখা

লোকেদের কথা, পথের-পাশের দৃশ্যাবলীর খণ্ডখণ্ড চিত্র। এর নরনারী দেখা দেয়না ব্যাপ্তি নিয়ে, আসে কোন-না-কোন বিশেষ রূপে, একটি ভাবের প্রতীক হ'য়ে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পে ফুটে উঠেছে একটি নির্লিপ্ত চঞ্চল বালকের নির্বন্ধন মনের ছবি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁইমাচা' গল্পে একটি বালিকার ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র দেখা দিয়েছে বেদনা-করুণ হ'য়ে। মনোজ বসুর 'অশ্বত্থামার দিদি'তে প্রতিফলিত হ'য়েছে একটি নারীর স্নেহাতুর হৃদয়। প্রত্যেকটি চরিত্রই ভাব-বিশেষের প্রতিমূর্তি। আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে তা'দের চরিত্রের জটিলতা, অথবা বিচিত্র পরিবর্তন পরিস্ফুট হয়নি। ছোটগল্পে তা' হওয়া সম্ভব নয়। মনোবিশ্লেষণ—ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে— কিঞ্চিৎ স্থান হয়তো পেতে পারে, যেমন পেয়েছে শৈলজানন্দের 'অতি ঘরন্তী না পায় ঘর'-এ। ওতেও একটিমাত্র ভাবেরই বিকাশ। মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা যে কতদূর প্রবল হ'তে পারে তা' গল্পটিতে নিপুণভাবে দেখানো হয়েছে।

গল্পের শ্রেণীবিভাগ করা কঠিন ব্যাপার। কোথাও ব্যক্তি, কোথাও ঘটনা, কোথাও একটি তত্ত্ব, আবার কোথাও বা একটি প্রাকৃতিক আবেষ্টন প্রাধান্য লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা'য় মিনির বিবাহ উপলক্ষ্য, কাবুলিওয়ালার হৃদয়টিকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখানো লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। ঘটনার প্রাধান্য এতে নেই। কিন্তু 'গুপ্তধন'-এ ঘটনা নিতান্ত অপ্রধান নয়। বিভূতিভূষণের 'নাস্তিক' গল্পে একটি চরিত্রকে অবলম্বন ক'রে একটি তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। 'ক্ষুধিতপাষাণ'-এ, 'এক রাত্রি'তে এবং বিভূতিভূষণের 'অভিশপ্তে' প্রাকৃতিক আবেষ্টনই গল্পের রসকেন্দ্র।

ছোটগল্পে যেমন বাস্তবের, তেমনি অলৌকিক ব্যাপারেরও স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথ অনেক গল্পে বাস্তব ও অলৌকিকের সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রেছেন। 'জীবিত ও মৃত' তা'র সুন্দর দৃষ্টান্ত। 'কঙ্কাল', 'মণিহারা' প্রভৃতিতেও অলৌকিক রহস্যচ্ছায়া বিকীর্ণ হ'য়েছে জীবনের উপর।

বিভূতিভূষণের 'মেঘমল্লার' গল্পে দেবীচরিত্রও স্থান পেয়েছে। আবার, শরৎচন্দ্রের 'মহেশ'-এ গফুর জোলা আর তা'র হতভাগ্য গোরুটির করুণ কাহিনী মর্মস্পর্শী হ'য়ে দেখা দিয়েছে। ইতর প্রাণীও গল্পের বিষয় হ'তে পারে, তা'র দৃষ্টান্ত পাই 'মহেশ'-এ, মণীন্দ্রলালের 'রতন'-এ, শৈলজানন্দের 'জনি ও টনি'তে। মণীন্দ্রলালের 'সবপেয়েছির দেশ'-এ স্বপ্ন-মায়া হ'য়েছে রূপায়িত।

গল্পের রচনাভঙ্গীও হ'তে পারে অনেক রকমের। কোথাও কথাবার্তা মোটেই নেই বা সামান্যই আছে, কোথাও সমস্তটা কিংবা প্রায় সবটাই কথোপকথন। কোথাও লেখকের উক্তিই সব, কোথাও আদ্যন্ত নায়ক-নায়িকার উক্তি। বিভূতিভূষণের 'নাস্তিক' ও 'বৌ-চণ্ডীর মাঠ'-এ কথোপকথন নেই বললেই চলে। আবার তাঁরই 'ঠেলা-গাড়ী' ও 'পুঁইমাচা'র প্রায় অর্ধেকটা কথোপকথন। বিষয়-অনুসারেই রচনারীতির তারতম্য।

অভিজ্ঞতা এবং আন্তরিক অনুভূতি ব্যতীত সাহিত্যের কোনও স্থায়ী সম্পদ্ গ'ড়ে ওঠেনা। গল্পের চরিত্র সম্বন্ধে লেখকের স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তিনি তা'কে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারেন না। সত্যকার সহানুভূতি এবং অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা ক'রে যাঁরা গল্প রচনা ক'রতে বসেন, তাঁ'দের লেখায় থেকে যায় কৃত্রিমতা, অবাস্তবতা। শুধু ভাষা-কৌশলে কোনও গল্পকে মর্মস্পর্শী ক'রে তোলা যায়না। অনেক গল্প তাই গতানুগতিক প্রেমকাহিনীর পুনরাবৃত্তি হ'য়ে দাঁড়ায়।

হৃদয় দিয়ে যাঁ'রা অপরের হৃদয়কে স্পর্শ ক'রতে পেরেছেন, তাঁ'দেরই লেখায় সর্বমানবের সুখদুঃখ আশা নিরাশার বিচিত্র রাগিণী ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে।

বাংলার গল্পসাহিত্য পাশ্চাত্ত্য গল্পসাহিত্যের ন্যায় বিপুলায়তন হ'য়ে ওঠেনি সত্য. কিন্তু এর সম্পদ্‌রাজি আজ নিতান্ত নগণ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থসমূহের অন্যতম, তা'তে সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমের 'যুগালাঙ্গুরীয়'কে ছোটগল্পের আসরে স্থান দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথই বাংলাসাহিত্যে ছোট গল্পের প্রবর্তক। শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পের সংখ্যা বেশী নয়, কিন্তু নিবিড় সহানুভূতি, অন্তর্দৃষ্টি এবং শিল্পসঙ্গতিগুণে সেগুলি অনায়াসে হৃদয় অধিকার ক'রে বসে। 'ছবি', 'মামলার ফল', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রভাতকুমারের ছোটগল্প বেশী সূক্ষ্মতার দিকে যায়নি, কিন্তু তা'র বাঁধুনি চমৎকার। হাস্যরস, করুণরস উভয়ের উদ্বোধনেই তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। একদিকে, 'মাষ্টার মশাই', 'আম্রতত্ত্ব', 'বলবান্ জামাতা',—অন্যদিকে 'আদরিণী'। সহজ সরল অনাড়ম্বর সৌন্দর্যে জলধর সেনের কয়েকটি ছোট গল্প উপভোগ্য। নিরুপমা দেবীর 'আলেয়া'কে ছোট গল্প ব'লে গণ্য করা চলেনা. কিন্তু ঐ বইয়েই অন্য দু'একটি সুন্দর ছোটগল্প আছে। সুরেশ সমাজপতি, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অতীতে খ্যাতিলাভ ক'রেছিলেন, আজ বিস্মৃতপ্রায়।

প্রমথ চৌধুরীর 'আহুতি' অতীত দিনের অর্ধবিস্মৃত জীবনের এক রোমাঞ্চকর চিত্র। 'ফরমায়েসী গল্প' নূতনত্বে উজ্জ্বল। ফরমাস্-মাফিক গল্প ব'লতে গিয়ে কাহিনীধারার ঘনঘন গতি-পরিবর্তন—

লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতাকে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছে। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জলছবি' এবং 'কল্পকথা' কবিত্বমধুর। মণীন্দ্রলাল বসুর 'মায়াপুরী', 'রক্তকমল' এবং 'সোনার হরিণ'-এর গল্পগুলিও কবি-স্বপ্ন-মণ্ডিত। দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট হাসি-পরিহাস, লীলা-কৌতুক উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে 'দার্জিলিঙে' গল্পে, আনন্দরসিক তরুণ মনের আদর্শ চিত্রিত হ'য়েছে 'অতিথি'-তে, সরল শিশু-মনের ছবি ফুটেছে 'সুধা'য়, মমতা-মধুর কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে পদ্মরাগ'-এ।

শৈলজানন্দের গল্পে পাই জীবনের রূঢ়কঠোর রূপ, দুঃখদৈন্য হতাশার ছবি, কখনও কখনও মানুষের আদিম প্রবৃত্তির উদ্দাম প্রকাশ। কয়লাকুঠির গল্পে সাঁওতাল কুলিদের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তা' প্রাণবন্ত। 'ভঙ্গুর' গল্পে মানব-জীবনের অনিত্যতা ও অনিশ্চয়তা বলিষ্ঠ রেখা-চিত্রে রূপ নিয়েছে। তাঁ'র ব'লবার ধরণও একটু নূতন। রূপকথার ভাষাভঙ্গীকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। দীর্ঘ বাক্য তাঁ'র রচনায় বিরল। ছোট ছোট, কাটা কাটা কথায় তিনি জমজমাট ক'রে গল্প বলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প শিল্প-সুষমার দিক্ থেকে অনবদ্য। আধুনিক জীবনের জটিলতাকে ক্ষুদ্র কাহিনীর মধ্যে এমন ক'রে আঁকতে পারেননি আর কেউ। মনের নানা গোপন অভিলাষ, অভিমান, আকর্ষণ ও বিরাগ সূক্ষ্ম রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। 'ধূলিধূসর', 'পুতুল ও প্রতিমা', 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' স্মরণীয় গল্প-গ্রন্থ। 'স্টোভ'-গল্পে মনের গোপন না-বলা কথার বিদ্যুৎ চমকে প্রতিটি পংক্তি উদ্ভাসিত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুকম্পা-স্নিগ্ধ কল্পনা-প্রবণ মন কখনও মুগ্ধ হ'য়েছে সাধারণ জীবনের হাসিকান্নায়, কখনও আকৃষ্ট হ'য়েছে দূরের স্বপ্নে। 'মেঘমল্লার', 'বেণীগির ফুলবাড়ী', 'বিধুমাস্টার' উৎকৃষ্ট গল্প-সংগ্রহ। মনোজবসুর

'বনমর্মর'-এ এবং পরবর্তী গল্পের বইগুলিতে কবিত্বের মাধুরী মিলেছে তৃপ্তিকর সহৃদয়তার সঙ্গে। জগদীশ গুপ্ত 'বিনোদিনী' নামক প্রথম গল্পের বইয়ে যে শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, পরবর্তী রচনায় তা' অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। 'প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী'তে গ্রাম্য বিরোধের এবং 'ভরাস্থথে' গল্পে নিয়তির নির্মম পরিহাসের চিত্র নৈপুণ্যের সঙ্গে অঙ্কিত হ'য়েছে। তাঁ'র ভাষার তীব্রতা মনকে সর্বদা সচেতন ক'রে রাখে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাতিস্মর' অভিনব কল্পনা-বৈভবে সমুজ্জ্বল। 'চুয়া-চন্দন'-এর গল্পেও নূতনত্ব আছে। ইতিহাসের বর্ণ-রাগে কোন কোন কাহিনী সুরঞ্জিত। রবীন্দ্রমৈত্রের 'থার্ডক্লাস' এবং 'উদাসীর মাঠ' দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল অনেকের। সীতাদেবী ও শান্তাদেবীর গল্পে আছে স্বচ্ছ দৃষ্টি, সুষমা ও সঙ্গতি। হাসির গল্পে তুলনা নেই পরশু-রামের। 'কচিসংসদ্', 'লম্বকর্ণ', 'ভূশণ্ডীর মাঠ' প্রভৃতি গল্প চিরন্তন সম্পদ্ রূপে গণ্য হ'য়েছে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাণুর প্রথম ভাগ' 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' 'বর্ষায়' প্রভৃতি বইয়ের অনেক গল্পে আছে কৌতুকমিশ্র সমবেদনার সরসতা। সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' নিষ্প্রাণ ক্ষয়িষ্ণু জাতির জীবন-আলেখ্য। বাংলার বাইরেকার ভারতবর্ষ আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'য়েছে এর গল্পগুলিতে। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'গণদেবতা' আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পটভূমিকে স্পষ্ট ক'রে দেখিয়ে দিয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের রচনা জোরালো। কোথাও-কোথাও তাঁ'র গল্পে বাস্তব পরিবেষকে উপেক্ষা ক'রে ঘটনা হয় রোমান্টিক। 'বনফুল'-এর হ্রস্বকায়া কাহিনীগুলি নিটোল শিশিরবিন্দুর মত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ইদানীং কথাসাহিত্যে খ্যাতি অর্জন ক'রেছেন; তবে, চমক লাগাবার চেষ্টা তাঁ'র লেখায় কৃত্রিমতার আভাস আনে। প্রবোধ

সান্যালের কয়েকটি গল্প মনে আনে মরীচিকার স্বপ্ন। বুদ্ধদেব বসুর 'রেখাচিত্রে' বিলীয়মান মুহূর্তগুলি রেখে গেছে স্মৃতির দাগ।

এখনও প্রচুর নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা র'য়েছে আমাদের সাহিত্যের এই বিভাগে। জীবন-সাগরে কত ঢেউ, কত রৌদ্র-জ্যোৎস্না-দীপ্ত ফেন-বুদ্বুদ। ঘরে ঘরে প্রতি ক্ষণে চলে হাসি-অশ্রুর লীলা, মনে মনে জাগে অনুরাগ-বিরাগের গোপন কম্পন। শিল্পীর তুলি ফুটিয়ে তুলবে তা'দের রূপ ভাষার রেখায় আর হৃদয়ের রঙে। ক্ষণ-গৌরবী আমাদের জীবন তাঁ'র হাতে পাবে আপন মর্যাদা।

'খাপছাড়া'র কবি

মনীষী রবীন্দ্রনাথের মনের আড়ালে রয়েছে এক চিরন্তন খেয়ালী শিশু, সে মানে না কোন বাঁধন, ধার ধারে না যুক্তির। বৃদ্ধের গাম্ভীর্যকে উপেক্ষা ক'রে সে হঠাৎ হাসির হিল্লোলে উচ্চকিত ক'রে তোলে আকাশকে, বলে—'বৃদ্ধের ও-বেশ ছদ্মবেশ, ওকে আমি মানব না।' কবিগুরু অমনি সায় দিয়ে বলেন, 'হাঁ, তাই, ওর সঙ্গে আমার মনের বয়স মেলে; আমি হব ওর খেলার সাথী।' তিনি নামেন খেলায়, হয়ত' বালির ঘর তৈরিতে। কিন্তু এখানেও তাঁর নৈপুণ্য। আগন্তুক শিশুর দল মুগ্ধ হয়ে দেখে আর ভাবে, এই আমাদের সত্যিকারের খেলাঘর, ঠাকুরদা আমাদের চিরদিনের খেলার সাথী।

"বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ। জগৎসংসার এবং তাহার কল্পনাগুলি তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে, একটার পর আর একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। * * * বহির্জগতে সমুদ্রতীরে বসিয়া বালক বালির ঘর রচনা করে। মানস-জগতের সিন্ধুতীরেও সে আনন্দে বসিয়া বালির ঘর বাঁধিতে থাকে।" —'ছেলেভুলানো ছড়া', রবীন্দ্রনাথ।

তাই শিশুমনের খামখেয়ালী খেলায় মুগ্ধ কবি বালির ঘর রচনা ক'রেছেন, ভাষা দিয়েছেন তার 'খাপছাড়া' ভাবগুলিকে; এলোমেলো ক্ষ্যাপামির বাতাসে উড়ে চলেছে হাল্‌কা হাসির ফেনা; অর্থ নেই তাতে, আছে প্রাণের সহজ উল্লাস।

কিন্তু এই সহজ উল্লাসকে প্রকাশ করা কাজটি সহজ নয়।

"কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
যা' তা' লেখা তেমন সহজ নয়তো।"

তুচ্ছ সব জিনিস নিয়ে যাদুকর দেখান যাদুবিদ্যার খেলা ; ব্যাপারটা হয়ত কিছুই নয়, কিন্তু অবাক হয়ে যায় দর্শক, ভাবে—কোথায় পেলেন যাদুকর তাঁর এই অদ্ভুত শক্তি ?

ঠিকানা নেই আগু পিছুর
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ঠাট্টা॥"

সেই ভোজবাজির ঠাট্টায় দেখতে দেখতে ভিড় জমে যায় ; কৌতূহলী শিশুর দল বিস্মিত হ'য়ে ঘিরে দাঁড়ায় ; তা'রা শোনে ছড়ার গুঞ্জন, দেখে কিম্ভূতকিমাকার মজার ছবি। অসম্ভব কল্পনা, আজগুবি ব্যাপার—মনের মধ্যে যেন খুনসুড়ি দিতে থাকে ; তা'রা হাসতে থাকে শুনে—

"ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির পাঁচ বোন থাকে কাল্‌নায়,
শাড়িগুলো তা'রা উনুনে বিছায়, হাঁড়িগুলো রাখে আল্‌নায়।
কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তা'রা লোহা-সিন্ধুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে বলে' রেখে দেয় খোলা জাল্‌নায়,
নুন দিয়ে তা'রা ছাঁচি পান সাজে, চুন দেয় তারা ডালনায়।"

শুধু কি ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির পাঁচ বোনের গল্প ? তা'রা শোনে মহাগম্ভীর রাজার কথা। রাজা ধ্যানে বসেছেন, বিশজন সর্দার হাঁকছে 'খবরদার'।

"সেনাপতি ডাক ছাড়ে,
মন্ত্রী সে দাড়ি নাড়ে,

যোগ দিল তা'র সাথে
ঢাক ঢোল বর্দার।
ধরাতল কম্পিত
পশুপ্রাণী লম্ফিত,
রাণীরা মূর্ছা যায়
আড়ালেতে পর্দার।"

সন্তোষের কাহিনীও কম মজাদার নয়। জঠরে অগ্নিদোষ হওয়ায় সে হাওয়া খেতে পচম্বা গিয়েছিল।

"নাকছাবি দিয়ে নাকে
বাঘ্‌নাপাড়ায় থাকে
বউ তা'র বেঁটে জগদম্বা।"

ডাক্তার গ্রেগ্‌সন ইনজেকশন দিতে বউ তো সাতফুট লম্বা হয়ে গেল। সন্তোষের হ'ল রাগ,—সে বলল, "অপমান সহিব কথম্‌ বা?—ওহে ডাক্তার, শীগ্‌গির আমার পায়া উঁচু ক'রে দাও, খড়মে ওষুধ লাগাও।" ডাক্তার তো "শুনে হতভম্বা।"

এমনি কবিতার পর কবিতা। অবিশ্বাস্য তার ঘটনা, অসম্বদ্ধ তা'র ভাব; অথচ মনোহরণ মিথ্যায় মন ভোলে শিশুর। প্রবীণ পাঠক হয়তো অণুবীক্ষণ ক'ষে আবিষ্কার ক'রতে চাইবেন আমাদের রীতিনীতি আচরণের প্রতি বিদ্রূপ, কিন্তু সে হবে কষ্টকল্পনা। হালকা মেঘের মত এরা ভেসে চলেছে দলে দলে, নির্দিষ্ট অর্থের বন্ধনে কোথাও বদ্ধ নয়।

"নীলুবাবু বলে—শোনো নেয়ামৎ দর্জি,
পুরানো ফ্যাশানটাতে নয় মোর মর্জি।

শুনে নিয়ামৎ মিঞা যতনে পঁচিশটে
সম্মুখে ছিদ্র, বোতাম দিল পৃষ্ঠে।
লাফ দিয়ে বলে নীলু—একী আশ্চর্যি
ঘরের গৃহিণী কয—রয়নাতো ধর্যি।”

রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-বিহারী শিশুকে ইতিপূর্বেও আমরা দেখেছি। ‘শিশু’তে এবং ‘শিশু ভোলানাথে’ শুনেছি তা’র চঞ্চল পদধ্বনি। কিন্তু ‘খাপছাড়া’র রস উপরিউক্ত দু’খানি কাব্যের রস থেকে স্বতন্ত্র। ‘শিশু’র কবিতাগুলিতে একটি মোহন মায়াস্বপ্ন জড়িয়ে আছে; সেখানে চোখে পড়ে শিশুর ব্যাকুল উৎসুক দৃষ্টি; সম্মুখে জীবনসাগর দুর্বোধ্য কল-গানে মুখর, সে শুনছে তার অশ্রান্ত সংগীত; মনে তার সহস্র স্বপ্ন, অযুত কামনা, দূরদূরান্তরের কত অজানা দেশের ছবি,—পরীর দেশ, পুরাণের দেশ, রূপকথার রূপরাজ্য জাগিয়ে তুলছে এক অনির্দেশ্য বেদনা। “মধুমাঝির নৌকোখানায়” চ’ড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিতে চায় সে, রামের মত লক্ষ্মণভাইকে নিয়ে বনবাসে যেতেও তার আপত্তি নেই, সাতভাই চম্পা আর পারুল দিদির দুঃখে তা’র হৃদয় আকুল, আবার মায়ের জন্যে “সাতরাজার ধন মাণিক” নিয়ে আসতে তা’র একান্ত সাধ। ‘খাপছাড়া’ কাব্যের রস কিন্তু এ রকমের নয়, এ শুধু কতকগুলি হালকা হাসির ছড়া, উদ্দেশ্যহীন, বেদনাহীন মজাদার কবিতার সম্ভার।

*   *   *   *

‘ছড়ার ছবি’তে গল্পের মত ক’রে বলা কতকগুলি জীবনচিত্র, হালকা তুলিতে আঁকা হ’লেও এগুলিতে আছে জীবনের স্বাদ, ‘জীবনস্মৃতি’ এবং ‘ছেলেবেলা’র কথা অনেক জায়গায় স্মরণ করিয়ে দেয়।

"বয়স তখন ছিল কাঁচা, হাল্‌কা দেহখানা
ছিল পাখির মত, শুধু ছিল না তা'র ডানা।

* * *

জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজী পাঠ ছেড়ে
মুখখানিতে ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে।
চুরি ক'রে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান্‌ উপদ্রবে।

* * *

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে,
ঐরাবতের শুঁড় দেখা যায় জলঢালা সব নলে,
অন্ধকারে শোনা যেত রিম্‌ঝিমিনি ধারা,
রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথহারা।"

শৈশবের সুমধুর স্মৃতি-জড়ানো অনেক ছবি ফুটে উঠেছে এর ভাষায়, আর ফুটেছে নন্দলালের অভ্রান্ত তুলির টানে। কি অবলীলাক্রমে দু'চারিটি রেখায় চিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছেন নন্দলাল, না দেখলে তা বোঝা যাবে না।

"ঈশান কোণে উড়্‌তি বালি আকাশখানা ছেয়ে
হু হু করে' আস্‌ছে ছুটে ধেয়ে"

সহজ কথায় সুন্দর ছবি। পাশেই তা'র নন্দলালের আঁকা ছবি—ঝোড়ো হাওয়ায় নদীতে ঢেউ উঠ্‌ছে, দ্রুতবেগে নৌকা চালিয়ে চ'লেছে ত্রস্ত মাঝির দল।

'অচলা বুড়ির বর্ণনা—

"অচল বুড়ি, মুখখানি তার হাসির রসে ভরা,
স্নেহের রসে পরিপক্ক অতি মধুর জরা।"

শুধু তা'র দেহের ছবি নয়, মনের ছবিও ফুটিয়ে তুলেছে। সকলে যাকে ঘৃণা করে, অচলা বুড়ি করে তা'র সেবা; সকল দীনতাকে উদ্ভাসিত ক'রে প্রকাশ পেয়েছে তা'র মনুষ্যত্বের অম্লান মহিমা।

দীনাতিদীন তুচ্ছ জীবন নিয়েই এর অধিকাংশ কবিতা; কিন্তু অবজ্ঞাত মানবের মনোমন্দিরে কবি দেখেছেন দেবতাকে এবং তাঁ'কেই দেখিয়েছেন—অনাবিল সরল অনুকম্পার আলোকে।

* * *

'সে' এক অদ্ভুত গল্প; অসংলগ্ন, অবাস্তবএর কল্পনা,—পদ্যে নয়, গদ্যে রচিত। ছোট্ট শিশু এর রসগ্রহণ করতে পারবে না, বালক ও কিশোর সাগ্রহে এ কাহিনী শুনবে। 'সে' যে কে, তা কে জানে?

"একদিন ঝমাঝম বৃষ্টি। বসে' বসে' ছবি আঁকছি। এখানকার মাঠের ছবি। উত্তর দিকে বরাবর চ'লে গেছে রাঙা মাটির রাস্তা,—দক্ষিণ দিকে পোড়ো জমি, উঁচুনিচু ঢেউখেলানো,—মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া বুনো খেজুর। দূরে দুটো চারটে তালগাছ আকাশের দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে। তারি পিছনে জমে' উঠেছে ঘন মেঘ, যেন একটা প্রকাণ্ড নীল বাঘ ওৎ পেতে আছে, কখন একলাফে মাঝ আকাশে উঠে সূর্যটাকে দেবে থাবার ঘা। বাটিতে রং গুলে এই সব এঁকে চলেছি।

"দরজায় পড়ল ঠেলা। খুলে দেখি, ডাকাত নয়, দৈত্য নয়, কোটালের পুত্তুর নয়—সেই লোকটা।" সুরু হ'ল গল্প। পুপু

দিদিমণি একমনে শুনে চলেছে। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, দাদামশায় জবাব দেন, আবার গল্প চলে। শেয়াল-কাঁটার বনের শেয়ালের গল্প, 'গেছোবাবা'র কাহিনী, তা'র পরেই 'ববকরণ', 'তৈতিলকরণ, বৈকুণ্ঠযোগ', দেখতে দেখতে এসে গেলেন স্মৃতিরত্নমশায়, "তিনি মোহনবাগানের গোলকীপারি ক'রে ক্যালকাটার কাছ থেকে একে একে পাঁচ গোল খেলেন। খেয়ে ক্ষিদে গেল না, উল্টো হোলো, পেট চোঁ চোঁ করতে লাগ্‌ল। সামনে পেলেন অক্‌টর্লোন মন্যুমেণ্ট। নিচে থেকে চাটতে চাটতে চূড়ো পর্যন্ত দিলেন চেটে।

বদরুদ্দিন মিঞা সেনেট হলে ব'সে জুতো সেলাই করছিল। সে হাঁ হাঁ করে' ছুটে এলো। বললে—আপনি শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে এতবড়ো জিনিসটাকে এঁটো করে' দিলেন? 'তোবা, তোবা' বলে তিনবার মন্যুমেণ্টের গায়ে থুথু ফেলে মিঞা সাহেব দৌড়ে গেল স্টেট্‌স্‌ম্যান অপিসে খবর দিতে। স্মৃতিরত্নমশায়ের হঠাৎ চৈতন্য হোলো, মুখটা তাঁর অশুদ্ধ হয়েছে। গেলেন ম্যুজিয়ামের দারোয়ানের কাছে। বল্‌লেন—পাঁড়েজি, তুমিও ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ; একটা অনুরোধ রাখতে হবে। পাঁড়েজি দাড়ি চুমরিয়ে সেলাম করে' বললে, কোমা ভূ পোর্তে সি ভূ প্লে। পণ্ডিতমশায় একটু চিন্তা করে' বললেন, বড়ো শক্ত প্রশ্ন, সাংখ্যকারিকা মিলিয়ে দেখে কা'ল জবাব দিয়ে যা'ব। বিশেষ, আজ আমার মুখ অশুদ্ধ, আমি মন্যুমেণ্ট চেটেছি। পাঁড়েজি দেশলাই দিয়ে বর্মা চুরুট ধরাল। দু'টান টেনে বললে, তাহ'লে এক্ষুনি খুলুন ওয়েবষ্টার ডিক্‌সনরি, দেখুন বিধান কি।"

'সে' এসে গল্প জুড়ে দিলে :—"তাসগানিয়াতে তাসখেলার নেমতন্ন ছিল। * *সেখানে কোজুমাচুকু ছিলেন বাড়ীর কর্তা, আর গিন্নির নাম ছিল শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুঙ্কুনা। তাঁদের বড়ো মেয়ের নাম

পামকুনি দেবী, স্বহস্তে রেঁধেছিলেন কিল্টিনাবুর মেরিউনাথু·····আর জালা ভর্তি ছিল কাঙচুটোর সাঙচানি।······এই সঙ্গে মিষ্টান্ন ছিল ইকৃটিকুটির ভিকৃটিমাই, ঝুড়িভর্তি।”

আবার গল্পকার দাদামশায়। গল্পের মধ্যে ছড়াও আছে—“সুঁদর বনের কেঁদো বাঘ, গায়ে তার চাকা চাকা দাগ।” সুকুমার দা'র কথায় হয়েছে গল্পের শেষ। গল্পের বাঁধুনি আলগা, ঘটনা এলোমেলো; যেন দার্জিলিঙের আকাশ, এই মেঘ, এই রোদ, এই বৃষ্টি, বুঝি কোন্ সৃষ্টিছাড়া অনিয়মের রাজত্ব। কিন্তু বিচিত্র এই খেলা, ক্ষণিক আলো আর অস্পষ্ট কুয়াশার লুকোচুরি, রং আর ছায়ার বিমোহন আলিম্পন।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরের চিরশিশু তা'র স্বপ্নদৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে জগতের পানে। সংসার তার মনের তটে আঘাত ক'রেছে, কিন্তু কল্পনার খেলাঘরটি ভাসিয়ে নিতে পারেনি।

[দেশ—২৭ বৈশাখ, ১৩৪৮]

মানসী

১

যে একান্তভাবে মনের, সেই তো মানসী। তা'কেই তো আমরা খুঁজে মরি সকল রূপে, সকল প্রেমে। প্রকৃতির সৌন্দর্যে যখন মুগ্ধ হই, মনের রঙে তা'কে রাঙাই, মানুষকে যখন ভালো লাগে, তখনও মনেরই কল্পনায় তা'কে মণ্ডিত ক'রে দেখি। বস্তুতঃ ভালোবাসি কা'কে? বাইরের বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষকে নয়, নিজেরই অন্তরের আদর্শকে, স্বপ্ন-প্রতিমাকে।

"আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে ক'রেছি রচনা,
তুমি আমারি যে, তুমি আমারি।"

এই কথাই রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র মূল কথা। শৈশবে শেফালি-বনে যা'কে দেখে প্রথম বিস্ময় জেগেছিল অন্তরে, যৌবনে যে কেড়ে নিয়েছিল হৃদয়, যা'র লীলামাধুরী ক্ষণে ক্ষণে মুগ্ধ ক'রেছে কবিকে, সে মনোময়ী ভাবপ্রতিমা তো ধরা দেয়না কোন বন্ধনে। তাই তো কবির প্রশ্ন:

"সেই তুমি
মূর্তিতে কি দিবে ধরা?"—'মানস-সুন্দরী'; সোনার তরী।

অন্তরবাসিনী এই 'নিরুপমা সৌন্দর্যপ্রতিমা'রই আভায় প্রভাত-সন্ধ্যা হয় আভাসিত, লাবণ্য-জ্যোতিতে প্রিয়মুখ হয় উজ্জ্বল।

সৌন্দর্য কি আছে জড়বস্তুর আকার-আয়তনে? মনের আলো প্রতিফলিত হ'য়ে তা'কে করে সুন্দর। প্রেম কি আছে কোথাও দেহের অস্থিমজ্জায়? অন্তরের ভাবদীপ্তিতে প্রেমের অধিষ্ঠান। তাই ভোগে মেলেনা তৃপ্তি, কাছে পেয়েও ভরেনা হৃদয়। প্রিয়ার মুখপানে তাকিয়ে ব্যাকুল প্রণয়ী বলে:

"খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকানো তোমায়,
সে কোথায়?"

নয়নের দৃষ্টিতে, "হাসির আড়ালে, বচনের সুধাস্রোতে" কা'র স্পর্শাতীত রূপজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, তা'কে তো দেহের সীমায় পাবার উপায় নেই! "আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। * * * যে আমার মনোরাজ্যের লোক, সে আজ বাহিরে আসিল কেন?"—'মেঘদূত'; প্রাচীনসাহিত্য। অন্তর-বাহিরের দ্বন্দ্বে জাগছে এই অনির্বচনীয় বিস্ময়। বারে বারে কবির মনে হ'চ্ছে সকল মূর্তিকে অবলম্বন ক'রে চ'লেছে এক অবন্ধনা রহস্যময়ীর লীলা, আমাদের হৃদয়মধ্যে যাঁ'র গোপন বসতি।

২

'মানসী'র প্রকাশ ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে। পশ্চিমে গাজিপুর শহরে এ'র অধিকাংশ কবিতা রচিত। স্থানটির বর্ণনা ক'রেছেন কবি:

"একখানা বড়ো বাংলা পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চর প'ড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার শর্ষের ক্ষেত ; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণ-টানা নৌকো চ'লেছে মন্থর গতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি, অনাদৃত, বাংলাদেশের মাটি হ'লে জঙ্গল হ'য়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পূর চলেছে মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলকচাঁপার ঘনপল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিম গাছ, তা'র বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা ধূলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁসে, দূরে দেখা যায় খোলার চালওয়ালা পল্লী।"

'কুহুধ্বনি' কবিতায় পাই ঐ জায়গার ছবি :

"প্রখর মধ্যাহ্নতাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে
বাষ্পশিখা অনলশ্বসনা
অন্বেষিয়া দশ দিশা যেন ধরণীর তৃষা
মেলিয়াছে লেলিহা রসনা।
ছায়া মেলি' সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন চারি
সিসু গাছ পাণ্ডুকিশলয়,
নিম্ব বৃক্ষ ঘনশাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা
আম্রবন তাম্রফলময়।
গোলক চাঁপার ফুলে গন্ধের হিল্লোল তুলে,
বন হ'তে আসে বাতায়নে,
ঝাউগাছ ছায়াহীন নিশ্বসিছে উদাসীন
শূন্যে চাহি' আপনার মনে।"

প্রখর মধ্যাহ্নে কোথা হ'তে ভেসে আসে কুহুস্বর। কবির মন ভেসে যায় দূর দূরান্তরে। এই কুহুধ্বনি যেন "প্রকৃতির মর্মগান পশিতেছে মানবের ঘরে।" আমাদের জীবনে যত-কিছু ভাঙাচোরা, বিশৃঙ্খল, প্রকৃতি তা'কে ভ'রে তুলতে চায় আপন সৌন্দর্যস্পর্শে— "জটিল সে ঝঞ্ঝনায়, বাঁধিয়া তুলিতে চায়, সৌন্দর্যের সরল সংগীতে।" প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের, অনন্ত মাধুর্যের প্রতীক যেন এই কুহুধ্বনি। এর সঙ্গে জড়িত কত কালের কত স্বপ্ন, কত স্মৃতি! যেদিন তমসা-তীরে শিশু কুশলবের পানে 'বিষাদে হরিষে' সীতা অনিমেষ নয়নে চেয়ে ছিলেন, বুঝিবা সেদিনও এমনি 'কুহুতানে' প্রকৃতির করুণা বর্ষিত হ'চ্ছিল। আবার 'লতাকুঞ্জ তপোবনে বিজনে দুষ্মন্তসনে' শকুন্তলা যেদিন 'লাজে থরথর', সেদিন তাঁ'র প্রেমকে মধুরতর ক'রে তুলেছিল এই 'কুহু-ভাষা'। রৌদ্রদগ্ধ দ্বিপহরে আজ মনে জাগে সে-দিনের কল্পনা, ভেসে আসে 'শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান'।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে পরবর্তী কালের আর-একটি কবিতা, 'খেয়া' কাব্যের 'কোকিল'। সেখানে 'প্রখর মধ্যাহ্নতাপ' নেই, পৌরাণিক কালের স্বপ্ন নেই, বিকেল বেলায় কোকিলের ডাক 'তিনশ বছর'-আগেকার পল্লীজীবনের সুর বহন ক'রে এনেছে, পুরাতন বাংলার 'গ্রাম-পথের মায়া' কবির চোখে 'অশ্রুজলের ছায়া' ফেলেছে। আজ 'শহর থেকে ঘণ্টা বাজে'। জীবনের ধারা যাচ্ছে বদলে'। কিন্তু চিরন্তনী প্রকৃতি অতীত-বর্তমানে বেঁধে দিচ্ছে মিলন-সেতু। তা'র স্পর্শ সেদিনের মতই মানব-অন্তরে এখনও জাগায় পুলক-বেদনা। 'কুহুধ্বনি'র মত 'একাল ও সেকাল' কবিতায়ও এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে। "বর্ষা এলায়েছে তা'র মেঘময় বেণী"। কবির মনে পড়ছে 'দূর বৃন্দাবনে' পাগলিনী রাধিকার কথা, ভূমিতে বিলীন বীণাকোলে

'যক্ষনারী'র বিরহাতুরা মূর্তি। মানস-লোকে তা'রা আমাদের অচেনা নয়।

"আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।"

নিজেকে দূরকালে প্রসারিত ক'রে দেখা রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম। 'মেঘদূত' প'ড়বার সময়ে তাঁ'র মনে হ'য়েছে, "শিপ্রাতীরের যূথীবনে যে পুষ্পলাবী রমণীরা ফুল তুলিত, অবন্তীর নগর-চত্বরে যে বৃদ্ধগণ উদয়নের গল্প বলিত এবং আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখিয়া যে পথিক প্রবাসীরা নিজ নিজ স্ত্রীর জন্য বিরহব্যাকুল হইত, তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে যেন সংযোগ থাকা উচিত ছিল।"

অতীত কালের চিত্র প্রায়ই তাঁ'র মনে জেগেছে কালিদাসের কাব্য অথবা বৈষ্ণব পদাবলী থেকে। ও দু'টি তাঁ'র কল্পনার দুই প্রধান উৎস।

৩

'মানসী'তে পাই প্রকৃতির দু'টি স্বতন্ত্র রূপ। 'কুহুধ্বনি', একাল ও সেকাল'-এ সে স্নেহকরুণ, 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'প্রকৃতির প্রতি'-তে নির্মম নিষ্ঠুর।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতির কল্যাণী মূর্তির সঙ্গেই আমরা বেশী পরিচিত। সে চেতনাময়ী, দেয় শোকে সান্ত্বনা, বেদনায় শান্তি। 'অহল্যার প্রতি'তে আমরা দেখি অভিশাপে পাষাণ হ'য়ে অহল্যা ধরিত্রীর কোলে ফিরে গিয়েছিল। কবি অনুমান ক'রেছেন, পৃথিবীর সাথে 'এক দেহ' হ'য়ে হয়তো 'জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা, সুপ্ত আত্মা-মাঝে স্বপ্নের

মত' অনুভব ক'রেছিল। মানবী-রূপে আবার যখন সে সংসারে ফিরে এল, তখন ধরণীর স্নিগ্ধহস্তস্পর্শে তা'র 'পাপতাপরেখা' মুছে গেছে। এই দৃষ্টিতেই তিনি প্রায় সব সময়ে প্রকৃতিকে দেখেছেন।

কিন্তু 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'প্রকৃতির প্রতি', 'সিন্ধুতরঙ্গ' বিপরীত ভাব নিয়ে লেখা। পুরীর সমুদ্রবক্ষে উঠেছে ঝড়। যাত্রীদল নিয়ে ডুবে যায় তরী। এ কি রাক্ষসীমূর্তি প্রকৃতির! "নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন, নিরানন্দ জড়ের নর্তন।"

শুধু অন্ধ অণু-পরমাণুর নৃত্য! এমন নিষ্করুণ পৃথিবীতে মানুষের হৃদয়ে কোথা থেকে এল ভালবাসা, এল মমতা?

৪

'মানসী'র প্রেমের কবিতাগুলিকেও দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একঅংশে মান-অভিমান-কামনা-বাসনাময় সাধারণ সাংসারিক প্রেমের কথা, অন্য অংশে ইন্দ্রিয়মোহাতীত যুগ-যুগান্তরের মহান্ প্রেমের গান। উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি এসেছে স্বাভাবিক পরিণতির পথে।

এই কাব্যের আরম্ভকবিতা—'ভুলে'। পুরানো প্রেম শিথিল হ'য়ে এসেছে, তাই, প্রেমিকের মনে জাগছে অভিমান। প্রিয়াকে ব'লছেন তিনি :

"দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে
সেদিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে।"

'ভুল-ভাঙা'তেও ঐ অভিমান :

"বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হ'য়েছে ভোর।

মালা ছিল, তা'র ফুলগুলি গেছে
র'য়েছে ডোর।"

প্রণয়ের প্রথম আবেগ এমনি ক'রেই মন্দীভূত হ'য়ে আসে, দৈহিক আসক্তি আনে অবসাদ, মিলন হ'য়ে ওঠে বন্ধন।

ভোগ-ক্লান্তির সুর ধ্বনিত হ'য়েছিল পূর্ববর্তী কাব্য 'কড়ি ও কোমল-এ, তবু আবার 'মানসী'-তে পিছন ফিরে তাকানো, অতীতের ভোগ-রাগের স্মরণে দীর্ঘশ্বাস। প্রেম এসেছিল, কিন্তু সে দিলনা তৃপ্তি, আন্‌ল বন্ধন-বেদনা : অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যথা জেগেছে কতকগুলি কবিতায়, কবি খুঁজেছেন মুক্তির পথ। বিরহে প্রেম পেয়েছিল নূতন স্বপ্ন-মাধুরী, প্রিয়ার সান্নিধ্যে সে স্বপ্ন গেল মিলিয়ে। কবি-কণ্ঠে তাই আক্ষেপের সুর :

"বিরহ সুমধুর হ'ল দূর কেন রে?
মিলন দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে!"

বাসনা-বিক্ষোভ থেকে ক্রমশঃ তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন আত্মার রহস্যলোকে। শুধু মিলনের মধ্যে সার্থকতা নেই প্রেমের, বরং বিরহে সে হয় বিশুদ্ধ, সুন্দর, এ-অনুভূতি জাগছে তাঁ'র হৃদয়ে; ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে মহত্তর প্রেমের আলোক। তিনি বুঝেছেন, "আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।" হাল্‌কা হাসি-অশ্রুতে ভোলেনা আর মন, "জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা" শোনবার আর শোনাবার জন্য তিনি আজ ব্যাকুল।

"দুটি প্রাণতন্ত্রী হ'তে পূর্ণ একতানে
উঠে গান অসীমের সিংহাসনপানে।"

প্রেয়সীকে 'মানসী'-রূপে, সমগ্রজীবনের ঈপ্সিতা-রূপে উপলব্ধির এই সূচনা। খণ্ড প্রেম হ'য়ে উঠেছে 'অনন্ত প্রেম'। ভোগাকাঙ্ক্ষার

অতৃপ্তি ও অনুশোচনা ব্যক্ত হ'য়েছে এই কাব্যেরই 'সুরদাসের প্রার্থনা'য়।

'মানসী'র কল্পনা রবীন্দ্রকাব্যে বিস্তৃত স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। 'মানস-সুন্দরী', 'চিত্রা', 'বিচিত্রা' তা'রই নামান্তর, 'জীবন-দেবতা' তা'রই রূপান্তর।

'মানসী'র যুগে রবীন্দ্রনাথকে অনেকে শেলীর সঙ্গে তুলনা ক'রতেন। বোধহয়, তাঁ'র 'Intellectual Beauty'র সঙ্গে অনেকে 'মানসী'র নামগত এবং ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্য ক'রেছিলেন। শুধু ঐ একটি কবিতায় নয়, Epipsychidion'এ, 'Alastor'-এ এবং আরও অনেক কবিতায় শেলী সেই রহস্যময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর কথা ব'লেছেন, যাঁর রূপবিভা ফুটে উঠছে সুন্দরী প্রকৃতির মুখে, সুন্দরী প্রিয়ার মুখে, পেয়েও যাঁকে পাওয়া যায়না, যিঁনি লীলাময়ী, চিরবাঞ্ছিতা, চির-পলাতকা।

৫

'মানসী' বা প্রেমময়ী সৌন্দর্যময়ী অন্তরলক্ষ্মীর কল্পনাই এ কাব্যের একমাত্র প্রেরণা নয়। অন্যান্যভাবের কবিতাও এ কাব্যে আছে। "আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে, গড়ে' তুলি মানসী প্রতিমা।" বহু উপাদানে রচিত মানসীপ্রতিমার পদতলে নানা ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে দিয়েছেন তিনি।

'বধূ' এ কাব্যে ভাবের দিক্ থেকে কতকটা একক, ঐ কবিতায় বর্ণিত বধূর মতই প্রায় নিঃসঙ্গ। গভীর অনুকম্পা-স্পর্শে গ্রাম্য বালিকার হৃদয়ের কথাগুলি বেজে উঠেছে করুণ রাগিণীতে। অবশ্য, প্রকৃতি-সংক্রান্ত কবিতাগুলির সঙ্গে এর অন্তরের যোগ আছে।

এ কাব্যের অনেক কবিতা স্বদেশ-সম্পর্কিত। পূর্ণ জীবনের সাধক ব'লেই কবি সৌন্দর্য ও প্রেমের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে বন্দী ক'রে রাখেননি। দেশানুরাগ ও কর্মপ্রেরণার যে গান 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কথা', 'কল্পনা' ও 'নৈবেদ্যে' উত্তরোত্তর স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, 'মানসী', এমন কি, 'কড়ি ও কোমল'-এ তা'র পূর্বাভাস লক্ষ্য করি। কবি ধীরে ধীরে গ'ড়ে তুলেছেন নিজেকে।

"চারিদিক্ হ'তে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি' আহরণ,
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে?"

গুরু গোবিন্দের মুখে ব্যক্ত এ আকাঙ্ক্ষা কবিরই মর্মমূলে জাগছে অনুক্ষণ।

'কড়ি ও কোমল'-এ শুনি:

"আমি গাঁথি আপনার চারিদিক্ ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে
দেখিনা এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন!"—'স্বপ্নরুদ্ধ'।

"জগতের প্রকাণ্ড জীবন"কে দেখবার আগ্রহে ভোগ-কারাগার ছেড়ে এসেছেন কবি।

'মানসী'র স্বাদেশিকতার কবিতাগুলিতে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুর লেগেছে। কিন্তু এ বিদ্রূপ বিদ্বেষজনিত নয়, এর মধ্যে নিহিত র'য়েছে তাঁর ভালোবাসা। দেশকে একান্তভাবে ভালোবেসেছেন ব'লেই তা'র দৈন্যে, অপমানে তিনি বেদনা বোধ ক'রেছেন এবং কঠোর কশাঘাতে জাতিকে জাগাতে চেয়েছেন—আলস্য, দুর্বলতা ও ছলনার

নাগপাশ থেকে। দেশসেবার আগ্রহ তাঁ'র মধ্যে প্রবল; সে দেশ-সেবা হ'বে অনলস কর্মসাধনা, শৌখীন ভাববিলাসিতা নয়। দুঃখ ক'রে কবি বলেছেন "অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব, জন দশেকে জটলা করি' তক্তপোষে ব'সে" শুধু তাসের আড্ডা জমাতে জানে, কিংবা বড় জোর "কাগজ নেড়ে উচ্চস্বরে, পোলিটিকাল তর্ক করে", "অত্যাচারে মত্তপারা" সে আত্মহারা হয়না, "জীবন-উচ্ছ্বাস" তা'র অন্তরে জাগেনা, দুর্যোগে দুর্দিনে পরস্পরকে ডেকে বলে: "এসো তো করি নামটা সহি লম্বা পিটিশানে।"

তাঁ'র বিদ্রূপের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কবি স্পষ্ট ক'রেই ব্যক্ত ক'রেছেন:

"দূর হউক এ বিড়ম্বনা
বিদ্রূপের ভান!
সবারে চাহে বেদনা দিতে
বেদনাভরা প্রাণ।
আমার এই হৃদয়তলে
শরম-তাপ সতত জ্বলে,
তাই তো চাহি হাসির ছলে
করিতে লাজ দান।"

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আছে, কিন্তু জাতিবিদ্বেষ নেই। "জগতে যত মহৎ আছে, হইব নত সবার কাছে" এই তাঁ'র আদর্শ। হিন্দুধর্মধ্বজী কয়েকটি বাঙালী যুবকের হাতে এক খ্রীস্টধর্মপ্রচারকের লাঞ্ছনার সংবাদ কাগজে বেরিয়েছিল। লজ্জিত, ব্যথিত কবি ঐ যুবকদের আচরণকে ধিক্কার দিয়েছেন 'ধর্মপ্রচার' কবিতায়।

প্রকৃতি, প্রেম আর দেশ—এই তিন উপচারে 'মানসী'র অর্ঘ্যরচনা। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কবির দৃষ্টি অন্তর্মুখী। যিনি মনোময়ী, তাঁ'কেই খুঁজেছেন কবি সকল রূপের অন্তরালে। গীতি-উচ্ছ্বাস-উদ্বেল, রোমান্টিক-স্বপ্ন-মণ্ডিত সুমধুর এর কবিতাগুলি। একমুখিতা, আবেগ, সুর-ব্যঞ্জনা—গীতিকবিতার প্রধান লক্ষণগুলি সবই এ কাব্যে পরিস্ফুট। আর, রোমান্টিকতার যা-কিছু গুণ—দূর-স্বপ্ন, বাসনা-বিক্ষোভ, কল্পনা-বিলাস—তা'ও উজ্জ্বল বর্ণরাগে রঞ্জিত ক'রেছে এই 'মানসী প্রতিমা'কে।

সোনার তরী

১

'সোনার তরী'র প্রথম প্রকাশ 'মানসী'র চা'র বছর পরে—১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে। এর অনেকগুলি কবিতা রচিত হ'য়েছিল নদীবক্ষে, অথবা নদীতীরে, বাংলার পল্লীদৃশ্যের মধ্যে।

"মানসী'র অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলুম পশ্চিমের এক শহরের বাংলা ঘরে। নতুনের স্পর্শ আমার মনের মধ্যে জাগিয়েছিল নতুন স্বাদের উত্তেজনা। * * * 'সোনার তরী'র লেখা আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। * * * কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি—বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে! পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্য সংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।"

প্রথম কবিতাতেই পদ্মাতীরের সেই ছবি :

> "একখানি ছোট ক্ষেত, আমি একেলা—
> চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।

পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়া মসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাত বেলা—
এপারেতে ছোট ক্ষেত, আমি একেলা।"

"'সোনার তরী' কবিতাটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনেক হ'য়েছে। কবি নিজে এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

'সোনার তরী' বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম, এই উপলক্ষ্যে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের ক্ষেত-টুকু দ্বীপের মত, চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত, ওই একটুখানি তার কাছে ব্যক্ত হ'য়ে আছে। * * * যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হ'ল, তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবেনা, কিন্তু যখন মানুষ বলে 'ওই সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো' তখন সংসার বলে—'তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখরার যোগ্য নও"!

ব্যাখ্যাটি সার্থক, তবু হৃদয়ে যেন দ্বিধা থেকে যায়। পদ্মাতীরের সৌন্দর্য-স্বর্গে ব'সে কবি কি সেদিন মানবজীবনের নশ্বরতার কথাই চিন্তা ক'রেছিলেন? কবিতাটির অপরূপ গীতিমাধুরীর মাঝখানে এ তত্ত্ব বড় কঠোর বলে মনে হয়। কবিতাটির রচনাকাল ১২৯৮ সাল,

এ ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ১৩১৫ সালে। রচনা-মুহূর্তের অনুভূতি ব্যাখ্যার সময়ে মনে নাও এসে থাকতে পারে। শান্তিনিকেতনের উপদেশ-ভাষণের বেলায় যে তত্ত্ব মনকে অধিকার ক'রেছিল, তা'কেই পরিস্ফুট ক'রবার জন্যে হয়তো এ নূতন ব্যাখ্যা সেদিন ক'রে নিয়েছিলেন। ১৩১৩ সালের এক চিঠিতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা ক'রে তিনি লিখছেন ঃ

"কিন্তু এ-সমস্ত ব্যাখ্যাকে ধিক্। এই সমস্ত কবিতার রস এই ব্যাখ্যার উপরেই যদি নির্ভর করে তবে ইহা বৃথাই লিখিত হইয়াছিল। মনে করোনা, কোনোই বিশেষ অর্থ নাই—কেবল বর্ষা, নদীর চর, কেবল মেঘলাদিনের ভাব, একটা ছবি একটা সংগীত মাত্রই যদি হয়, তাহাতে ক্ষতি কী?"

এমনও কি হ'তে পারে না, সে মেঘলা দিন অন্য রকমের অনুভূতি জাগিয়েছিল কবির মনে? তিনি তো ব'লেছেন "এই উপলক্ষ্যে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।" অন্য মানে হ'তে পারে না, অথবা লেখার সময়ে ঐ ভাবই তাঁর মনে এসেছিল, এ কথা তো তিনি বলেননি।

আমি যখনই পড়ি, এ কবিতার অন্য একটি অর্থ আমার মনে আসে। ভাদ্রের ভরা নদী। কবি কূলে ব'সে আছেন। দূর থেকে শাদা-পাল-তোলা একখানি নৌকা কাছে এসে আবার দিগন্তে মিলিয়ে গেল। মুহূর্তের স্বপ্ন! এম্‌নি ক'রেই অসীমসৌন্দর্যময় দেবতা চকিতে দেখা দিয়ে কোথায় অন্তর্ধান করেন। ক্ষণ-রূপের মধ্যে অরূপের স্পর্শ। আমাদের মুগ্ধ হৃদয় ভোলে তাঁ'র সৌন্দর্যে, নিবেদন করে আবেগ-কল্পনার সোনার ফসল, চায় তাঁর রূপতরীতে চিরন্তন একটি স্থান। কিন্তু তা তো হবার জো নেই। অনন্ত সুন্দরকে পাই শুধু জীবনের

দু'একটি পরমক্ষণে—অনন্ত আনন্দের সঙ্গে স্থাপন ক'রতে পারিনা অন্তরের অবিচ্ছিন্ন যোগ।

বিশ্বপ্রবাহের ক্ষুদ্র তীরপ্রান্তে কবির 'একখানি ছোট ক্ষেত।' ব'য়ে চলেছে বিশ্ব-দেবতার সৌন্দর্য-তরী। কালের ঊর্মিগুলি ভাঙছে দু'ধারে। লৌকিক দৃষ্টিতে দেখবার তরী এ নয়, ভাবলোকে এর সত্যতা।

'সোনার তরী' নামটিতেই সংসারাতীত কল্পনার ইঙ্গিত আছে। 'মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা' কবি পেয়েছিলেন তা'র সাক্ষাৎ। প্রখর আলোকে নয়, পৃথিবী যখন কোমল স্বপ্নে ঘেরা, মিশে যায় অনন্ত আকাশের সাথে, হৃদয়ে ঘনায় অপার রহস্যানুভূতি, এম্‌নি কোনও সৌভাগ্যক্ষণেই মেলে তা'র দেখা। কৃতার্থ মনে হয় নিজেকে। কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়না এই ভাবদৃষ্টি, লোকাতীত রহস্যের উপলব্ধি। ভেঙে যায় স্বপ্ন। মন ফিরে আসে স্থূল বাস্তব জগতে। কোথায় মিলায় সে সৌন্দর্যলোক, চারিদিক্ বোধ হয় শূন্য!

"শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি'।"

২

রোমান্টিক কল্পনা যেমন 'মানসী'তে, তেমনি 'সোনার তরী'তেও সঞ্চার ক'রেছে মায়া-মাধুরী। কয়েকটি কবিতায় ছড়িয়ে আছে রূপকথার ইন্দ্রজাল; যেমন, 'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা'। 'শৈশবসন্ধ্যায় কবির মনে পড়েছে ছেলেবেলাকার সরল আনন্দময় জীবন,

"কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব কল্পনা
কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা
অনন্ত বিশ্বাস।"

তাঁ'র শৈশব হারিয়ে গেলেও পৃথিবী থেকে শৈশব বিদায় নেয়নি।

"রয়েছে পৃথিবী ভরি' বালিকা বালক
সন্ধ্যাশয্যা, মা'র মুখ, দীপের আলোক।"

শুধু রূপকথার মায়ালোকেই নিবদ্ধ থাকেনি তাঁ'র রোমান্টিক দৃষ্টি, প্রকৃতি ও জীবনকে রঞ্জিত ক'রেছে ইন্দ্রধনুবর্ণে।

রূপের মধ্যে অরূপের বা অপরূপের আভাস যেমন 'সোনার তরী'তে তেমনি 'পরশপাথর'-এও পেয়েছি। যার স্পর্শে সব সোনা হ'য়ে ওঠে সেই পরশ পাথরের খোঁজে সন্ন্যাসী ছেড়েছিলেন সংসার। কিন্তু সংসার ছেড়ে যাবার কি কোন প্রয়োজন ছিল? লোকের মধ্যেই কি মেলেনা লোকাতীত আনন্দের সন্ধান? জগৎসমুদ্রমন্থন ক'রেই না দেবগণ পেয়েছিলেন অমৃত?

সীমার মধ্যে স্পর্শ রেখে যান অসীম, রূপ-সাগরে লুকিয়ে থাকে অরূপ রতন। আমরা হয়তো দেখেও দেখিনা। তত্ত্বের জালে মন যা'র বাঁধা পড়েনি, সহজ সরল যা'র দৃষ্টি, সেই 'গ্রামবাসী ছেলে' সন্ন্যাসীর চোখ ফেরাল সোনার শিকলের দিকে।

"সন্ন্যাসী চমকি' ওঠে, শিকল সোনার বটে,
লোহা সে হয়েছে সোনা জানেনা কখন।"

প্রেমের ছোঁওয়ায় লোহার শিকল হয় সোনার, বন্ধন রূপান্তরিত হয় আনন্দে।

"বন্ধন? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন—
স্নেহ প্রেম সুখতৃষ্ণা; সে যে মাতৃপাণি
স্তন হ'তে স্তনান্তরে লইতেছে টানি,

নব নব রসস্রোতে পূর্ণ করি' মন
সদা করাইছে পান।" ——'বন্ধন'।

জীবনের কোন্ শুভমুহূর্তে বন্ধনের মধ্যেই 'মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ' পাবার অবকাশ আসে, কে জানে? যদি উপেক্ষা করি তা'কে, তবে দুর্ভাগ্য আমরা। অনন্তকে একবারে কোথায় পা'ব? দেখতে জানলে দেখি, 'কত মুহূর্তের 'পরে' সে তা'র 'চিহ্ন লিখে' গেছে!

৩

এ ভাব বারে বারে দেখা দিয়েছে রবীন্দ্র-রচনায়। তিনি যে 'পৃথিবীর কবি', 'বসুন্ধরা'র স্নেহবন্ধনে চিরবন্দী। এই ভালোবাসার ডোর ছিন্ন ক'রে কোথায় মুক্তি পাবে মানুষ? প্রকৃতির প্রেমে আর মানুষের প্রেমে পাই আনন্দময়ের অমৃতস্পর্শ।

'পরশপাথর'-এর সঙ্গে ভাবের মিল আছে 'আকাশের চাঁদ'-এর। অবাস্তব আদর্শের ব্যর্থতা দেখান হ'য়েছে উভয় স্থলেই। পরশ-পাথরের সন্ন্যাসীর মত 'আকাশের চাঁদ'-প্রার্থীও জীবনের ক্ষুদ্র মুহূর্তগুলিকে গিয়েছে তুচ্ছ ক'রে। "সংসারসুখ কাছে কাছে তার কত আসে যায় ভাসি", কিন্তু সেদিকে মন নেই তা'র। "অবশেষে যবে জীবনের দিন আর বেশী বাকি নাই", তখন সে তাকা'ল পৃথিবীর পানে। "দেখিল ধরণী শ্যামল মধুর সুনীল সিন্ধুতীরে।"

"দেখে, বহুদূরে ছায়াপুরী সম
অতীত জীবনরেখা
অস্তরবির সোনার কিরণে
নূতন বরণে লেখা।

যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া
চাহেনি কখনো ফিরে
নবীন আভায় দেখা দেয় তা'রা
স্মৃতি সাগরের তীরে।
হতাশ হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
পূরবী রাগিণী বাজে ;
দু'বাহু বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায়
ওই জীবনের মাঝে।"

পরশপাথ'র-এর সন্ন্যাসীও তো জীবনসন্ধ্যায় অনুতপ্ত হৃদয়ে "পূর্বপথে যায় ফিরে, খুঁজিতে নূতন ক'রে হারানো রতন।"

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটিকাতেও এক ভ্রান্ত সন্ন্যাসীর কথা আছে। স্নেহবন্ধন ছিন্ন ক'রে সে চেয়েছিল ভগবান্‌কে। সে সাধনা তা'র বিফল হয়েছে।

৪

বিশ্বের মধ্যে আছেন বিশ্বদেবতা, পার্থিব প্রেমের মধ্যে পাই প্রেমময়ের পরিচয়, 'বৈষ্ণব কবিতা'র ও তাৎপর্য এই। এই কথাই 'দেউল'-এ প্রকাশ পেয়েছে অন্যভাবে। "বাহিরে ফেলি' এ ত্রিভুবন, ভুলিয়া গিয়া বিশ্বজন" যে দেউল রচনা করি আমরা, তা'র মধ্যে দেবতাকে দেখিনা তাঁ'র পূর্ণ মহিমায়। বজ্রাঘাতে একদিন স্বপ্ন-কল্পনার পাষাণ-মন্দির পড়ে ভেঙে, জীবনের মধ্যে হয় জীবনদেবতার আবির্ভাব।

"নীরব ধ্যান করিয়া চুর
কঠিন বাঁধ করিয়া দূর

সংসারের অশেষ সুর
ভিতরে এল ছুটি
পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি'।
দেবতা পানে চাহিনু একবার
আলোক আসি' পড়েছে মুখে তাঁ'র।
নূতন এক মহিমা রাশি
ললাটে তাঁর উঠিছে ভাসি'
জাগিছে এক প্রসাদ-হাসি
অধর-চারিধার।
দেবতা পানে চাহিনু একবার।"

জগৎ থেকে জগদীশ্বরকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা চলে না।

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

—গীতাঞ্জলি।

ক্ষুদ্র মন্দির কোথায় রাখবে তাঁ'কে বেঁধে? তিনি যে বলেন:

"আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্ত নীলিমা মাঝে; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য শান্তি দয়া প্রেম"। —দীনদান; কথা ও কাহিনী।

প্রকৃতির সৌন্দর্যে, জীবনের সুখে দুঃখে ভগবানের প্রকাশ, 'পূরবী'র 'ভাঙামন্দির' কবিতারও মূল কথা এই। জীবকে ছেড়ে নয়, জীবের সঙ্গেই থাকেন 'জীববৎসল' ভগবান্। বৈরাগ্যবাদে বিশ্বাস নেই কবির।

'মায়াবাদ', 'খেলা', 'বন্ধন', 'গতি', 'মুক্তি' প্রভৃতি কবিতাতেও ফুটে উঠেছে বৈরাগ্যবাদের প্রতি কবির বিরাগ।

৫

জীবনপ্রীতি রবীন্দ্রকাব্যের প্রাণস্বরূপ। "মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"—বারে বারে এ কথা ব্যক্ত হ'য়েছে তাঁ'র বিভিন্ন রচনায় বিভিন্ন ভাষায়। পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা এই জীবন-প্রীতির আনুষঙ্গিক।

স্নেহপ্রেমরসে মধুর এই জীবন। ভালোবাসার 'সোনার বাঁধনে' গৃহলক্ষ্মী বাঁধা থাকেন সংসারে। ঐ বাঁধনে শিশু বেঁধে রাখতে চায় তা'র প্রিয়জনকে।

> "চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
> অনন্ত সংসার।"

শুধু মানব-জীবনে নয়, মনে হয়, এ প্রেমের আকর্ষণ সমগ্র জগতে বিদ্যমান।

> "তৃণ ক্ষুদ্র অতি
> তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
> কহিছেন প্রাণপণে—যেতে নাহি দিব।"
>
> —যেতে নাহি দিব।

মানব-জীবনের সঙ্গে প্রকৃতিকে একাত্ম ক'রে দেখা রবীন্দ্রচিত্তের স্বধর্ম্ম। 'যেতে নাহি দিব'-তেও রয়েছে তার নিদর্শন।

৬

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন, প্রকৃতি প্রাণময়ী, পৃথিবী স্নেহময়ী।

> "দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি।
> রে ধরিত্রী—স্নেহ তোর বেশি ভালো লাগে।"
>
> —দরিদ্রা।

এই দীনা "জননী মৃন্ময়ী, সকলের মুখে অন্ন" জোগাবার জন্য ব্যাকুল। 'বর্ণগন্ধগীতে" সে আমাদের জন্য রচনা করে 'আনন্দ-আবাস'।

"স্বর্গ নাই, র'চেছিস স্বর্গের আভাস।"

তাই

'জন্মেছি যে মর্ত্ত্যকোলে, ঘৃণা করি তারে
ছুটিবনা স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।" —আত্মসমর্পণ।

পৃথিবীর প্রতি কবির ভালোবাসা আবেগ-উচ্ছ্বসিত হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে 'বসুন্ধরা'য়।

শুধু তো এক জন্মের নয়, জন্ম-জন্মান্তরের নাড়ীর যোগ এই পৃথিবীর সাথে।

"আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের; তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী-দিন
যুগযুগান্তর ধরি' আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে। বর্ষণ করেছে তরুরাশি
পত্র ফুল ফল গন্ধ রেণু।"

এই ভাবই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'ছিন্নপত্রে' :

"আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করেছেন—তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে

এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হ'য়ে উঠেছিলাম। * * * তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দু'জনে একলা মুখোমুখি ক'রে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"

পরবর্তী কালের 'প্রবাসী' কবিতাতেও এই কথা :

"মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে
সে দুয়ার খুলি' কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।"

সমুদ্রগর্ভ থেকে পৃথিবীর নিষ্ক্রমণের পূর্বেও তিনি ছিলেন তার অঙ্গীভূত।

"মনে হয়, যেন মনে পড়ে,
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট্ জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ মাঝে," —সমুদ্রের প্রতি।

দীর্ঘকালের এই স্নেহপ্রীতির বন্ধন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের, তাই প্রকৃতি এমন ক'রে টানে মানুষের মন।

৭

'সমুদ্রের প্রতি'তে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার কথা ছাড়া আর-একটি কথা আছে, মানবের মনোগত আদর্শের কথা। যুগ-যুগান্তর ধ'রে ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে—মানুষ নব নব সৃষ্টির সাধনায় রত। বর্তমানের দুঃখ দৈন্য অভাব অপূর্ণতা দূর ক'রে সে আবাহন ক'রবে গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে, এই তার সাধ। বিষয়ী লোক হয়তো বিশ্বাস করেনা এ স্বপ্নে, কিন্তু আদর্শবাদীর মনে জাগে আশা।

"তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম তারে সত্য বলে জানে ;
সহস্র ব্যাঘাতমাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে।"

সাগরতলে যেমন অলক্ষিতে কতকাল ধরে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর দেহ, তেমনি

"মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে,
আপনি সে নাহি জানে।"

আনন্দদীপ্ত নবযুগ আজ আছে ভাবুকের কল্পনায়। কে জানে একদিন তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে কিনা ?

"মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,
অসংখ্য কামনা,
রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে ওঠে মাতি'
তাদের খেলায় হতে সাথী।" —বলাকা।

৮

প্রেমের বিচিত্র রূপ অঙ্কিত হয়েছে এ কাব্যে। কখনও তা রূপকথার রোমান্টিক স্বপ্নমাত্র—যেমন 'রাজার ছেলে' ও 'রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা' এবং 'সুপ্তোত্থিতা'য়, কখনও নর-নারীর লীলাচঞ্চল বাসনা-বেদনা—যেমন 'তোমরা ও আমরা', 'দুর্বোধ', 'হৃদয়যমুনা', 'ব্যর্থযৌবন' 'প্রত্যাখ্যান' ও 'লজ্জায়' ; কখনও শান্ত সুমধুর দাম্পত্যবন্ধন—যেমন 'সোনার বাঁধন'-এ ; আর কখনও তা' সকল সৌন্দর্য-মাধুর্যের অন্তরাত্মা-রূপিণী 'মানস-সুন্দরী' বা 'জীবন-দেবতা'র প্রতি চিররহস্য-ময় আকর্ষণ। জীবন-দেবতার উপলব্ধি স্পষ্টতর হয়েছে পরবর্তী কাব্যে। ঐ নামও কবি এখানে ব্যবহার করেননি। কিন্তু প্রত্যক্ষের অন্তরালে এক অপ্রত্যক্ষ শক্তির আভাস পেয়েছেন তিনি। প্রত্যক্ষ

রূপ, প্রত্যক্ষ প্রেম খণ্ড, ক্ষণিক ; তবু চিরন্তন রূপ আর চিরন্তন প্রেম ছায়া ফেলে যায় তা'র উপর। তাই তো বর্ষা-প্রভাতে কা'কে দেখি সোনার তরী বেয়ে যেতে। মৃত্যুহীন সে সৌন্দর্য-তরী। সকল ভালো-লাগায় অনুভব করি কার অন্তহীন ভালোবাসা ; জীবন-সমুদ্র-পথে কে হয় চিরসঙ্গিনী !

"এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী * * *
এর কোনো কূল আছে ?" —মানসসুন্দরী।

এই চিরসঙ্গিনীই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র সুন্দরী। সে তো শুধু এক জন্মের নয়, কত জন্মের লীলার সাথী।

"জানি, আমি জানি' সখি,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখোচোখি
সেই পরজন্মপথে, দাঁড়াব চমকি'।"

অতীতের স্মৃতি-কুহেলি ঘেরা আলোর মত দেখা দেয় হৃদয়প্রান্তে :

"পূর্ব জন্মে নারীরূপে ছিলে না কি তুমি
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি
প্রণয়ে বিকশি' ?"

অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে কবিকে কোথায় নিয়ে চলেছে সে, কে জানে ?

"তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে ?

মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না ব'লে।" —নিরুদ্দেশ যাত্রা।

৯

অপ্রত্যক্ষ শক্তির কল্পনা 'সোনার তরী'তে রোমান্টিক-স্বপ্ন-মণ্ডিত। 'চিত্রা'য় তা মিস্‌টিক বা মরমিয়া-ভাবরাজ্যে প্রবেশ ক'রেছে। রোমান্টিক মন দূরের স্বপ্নে উতলা ব্যাকুল। কাম্যকে না পাওয়ার ব্যথা তার তীব্র প্রবল। উপলব্ধির গাঢ়তা নয়, আকাঙ্ক্ষার চঞ্চলতা তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। মিস্‌টিক মন অপেক্ষাকৃত শান্ত; ঢেউয়ের দোলায় অসহায় ভাবে সে দোলেনা, ডুব দেয় ঢেউয়ের তলায়, দেখে শাশ্বত সত্যের মণিদীপ্তি। 'সোনার তরী'তে কবি ক্ষুব্ধ অধীর:

কতবার মনে শঙ্কা করি
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল"
—মানসসুন্দরী।

বাঞ্ছিতা তাঁর অপরিচিতা:

"বলো দেখি মোরে শুধাই তোমায়
অপরিচিতা" —নিরুদ্দেশযাত্রা।

'চিত্রা'য় এসেছে প্রাপ্তির প্রসন্নতা:

"অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী" —চিত্রা।

অবশ্য, রোমান্টিক ও মিস্‌টিকের সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে টানা কঠিন। অনেক সময়ে রোমান্টিকের বিস্ময়ানুভূতি তাঁকে নিয়ে চলে পরম-রহস্য-লোকের পানে, সত্যানুসন্ধানের অভিমুখে। ক্রমে তিনি উত্তীর্ণ হ'ন মিস্‌টিক উষালোকের দেশে। সেখানেও অনেক

সময়ে দেখি, পাওয়া-না পাওয়ার আনন্দ-বেদনায় মেশামিশি, আঁধার-আলোয় স্বপ্নময় আকাশ।

১০

যিনি অসীম সুন্দর, অনন্ত আনন্দময়, তাঁকেই আমরা খুঁজি আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে। তিনিই 'সোনার তরী'র মাঝি, 'মানসী' 'মানসসুন্দরী' 'জীবন-দেবতা'। তাঁর সঙ্গে যুগে যুগে আমাদের মিলন-বিরহের লীলা। আমরা যেমন তাঁকে চাই, তিনিও তেমনি চা'ন আমাদের। অসীম ও সসীমের এই সম্বন্ধের কথাই বলা হয়েছে 'দুই পাখি'তে।

"দু'জনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা
কাতরে কহে কাছে আয়।"

এই সম্বন্ধের কথাই পাই অন্যত্র:

"অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।"

—উৎসর্গ, ১৭নং।

অপূর্ণের মধ্য দিয়ে পূর্ণ আপনাকে উপলব্ধি করেন, বহু সাধকের মতে, সৃষ্টির গোড়াকার কথা এই। বৈষ্ণবের লীলাবাদে এই তত্ত্ব প্রেমমাধুরীমণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে। বৈষ্ণব-ভাব-রসকে গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু বৈষ্ণব কবি যেখানে নির্দিষ্ট রূপে বা মূর্ত্তিতে তন্ময়, রবীন্দ্রনাথ সেখানে "চঞ্চল, সুদূরের পিয়াসী।" উভয়ের মধ্যে মিল আছে, অথচ ষোল-আনা মিল নেই। তবু এই লীলানুভূতি তাঁ'র বহু কবিতায় দিয়েছে আবেগ, সঞ্চার করেছে প্রাণ।

'দুইপাখি'র অন্তর্নিহিত ভাব আছে উপনিষদের একটি শ্লোকে। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ছেলেবেলায় ভৃত্যের আঁকা গণ্ডীতে বন্দী থেকে বাইরের জন্য মনে যে ব্যাকুলতা জন্মাত, 'দুইপাখি' তা'র কথা মনে এনে দেয়।

১১

তত্ত্ববিরহিত সৌন্দর্যচিত্র হিসাবে 'নদীপথে' এবং 'ভরা ভাদরে' কবিতা দু'টি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে ধ্বনিঝঙ্কার এবং চিত্রশোভা যেমন মনোরম, তেমনি হৃদয়স্পর্শী ভাবাকুলতা।

"গগন ঢাকা ঘন মেঘে
পবন বহে খর বেগে।
অশনি ঝনঝন
ধ্বনিছে ঘনঘন
নদীতে ঢেউ ওঠে জেগে।
পবন বহে খর বেগে।"

এই দুর্যোগে কবি তীরে তরী বেঁধেছেন। রাত্রি ঘনিয়ে আসে।

"চকিত আঁখি দু'টি তার
মনে আসিছে বারবার।
বাহিরে মহাঝড়
বজ্র কড়মড়
আকাশ করে হাহাকার।
মনে পড়িছে আঁখি তার।"

'ভরাভাদরে'র সুরে এমন উদ্বেলতা নেই। প্রকৃতি আপন পূর্ণতায় মন্থর।

"কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে
নিরাকুল ফুলভারে
বকুল বাগান।
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরাণ।"

১২

'মানসী', 'সোনার তরী' সৌন্দর্য-উপভোগের কাব্য। কিন্তু কবি ভোলেননি যে, শুধু সৌন্দর্যভোগ আনে অবসাদ। দুঃখের আঘাতে জাগে চেতনা। তাই "স্বপ্নশয়ন করিয়া হেলা" কবি "পরাণের সাথে মরণ খেলা"য় উদ্যত। এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি শুনি 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' এবং 'কল্পনা'র 'দুঃসময়', 'অশেষ', 'বর্ষশেষ' প্রভৃতিতে।

মরণকে প্রিয়রূপে কল্পনা 'ভানুসিংহের পদাবলী' থেকে শুরু ক'রে তাঁর বহু কাব্যেই দেখা গিয়েছে। এই কাব্যের 'প্রতীক্ষা'তেও আছে সে কল্পনা।

মুমূর্ষু স্বদেশবাসীর জড়তা ও সংকীর্ণতায় ব্যথিত কবির মন। 'বিশ্বনৃত্যে'র আন্দোলনে কবে ঘুচবে এই ক্লৈব্য,

"ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস"

সেই দিনের জন্য কবি প্রতীক্ষমান।

তাদের সংকীর্ণতা, প্রগল্‌ভতা, পাণ্ডিত্যাভিমান বিদ্রূপ-লাঞ্ছিত হয়েছে 'হিং টিং ছট্'-এ। ধর্মের নামে, শাস্ত্রের নামে অনেক অর্থহীন উক্তি চলে আমাদের দেশে. পণ্ডিতেরা তার মনগড়া ব্যাখ্যা ক'রে তাক

লাগিয়ে দেন জনসাধারণের। বাক্‌চাতুরীতে এবং ব্যাখ্যানৈপুণ্যে বাঙালীর তুলনা নেই। কোন কোন ইংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য হিন্দু প্রমাণ ক'রতে চান, হিন্দুশাস্ত্রের মত শাস্ত্র নেই এবং আমাদের যে-কোন বাক্যই বেদবাক্য। এমনি এক 'যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা' রাজস্বপ্নের অর্থ আবিষ্কার ক'রে সবাইকে হারিয়ে দিলেন। এই অর্থ-আবিষ্কারের মহিমা যে বুঝবে, তা'র

"বিশ্বে আর বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি' বুঝিবে চকিতে।"

যেমন 'মানসী'র বিদ্রূপ-কবিতায়, তেমনি এখানেও ব্যঙ্গের অন্তরালে রয়েছে দেশের প্রতি কবির নিবিড় ভালোবাসা, তার দোষ ত্রুটি দুর্বলতায় গভীর বেদনাবোধ।

১৩

কবির কাজ কি? প্রকৃতির চিরন্তন সৌন্দর্যকে আমাদের মনোগ্রাহ্য ক'রে আঁকা, জীবনের আনন্দবেদনাকে অনুভূতি-স্পর্শে সরস ক'রে তুলে ধরা। বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি পান ঐক্যের সন্ধান, তাঁর দৃষ্টির আলোকে অতীত-বর্তমানের সীমারেখা যায় মুছে। 'পুরস্কার' কবিতায় পাই ভাব-বিভোর কবির চিত্র।

"ধরণীর তলে গগনের গায়
সাগরের জলে, অরণ্যছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর

দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর
তার পরে ছুটি নিব।”

“আর একটুখানি নবীন আভা”—

“The light that never was on sea or land”, “যে আলো ছিলনা সমুদ্রে বা ধরণীতে” (‘প্রকৃতি ও কবি’ ; ওআর্ডস্ওআর্থ ’— এই তো কবি-কল্পনার আলো।

শুধু কি বর্তমান নিয়ে কবির কাব্য ? না, তা তো নয়। এ পৃথিবী যে চিরনূতন অথচ চিরপুরাতন।

“বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা
লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।”

‘মানসী’তে আমরা দেখেছি, ‘মেঘদূত’, ‘একাল ও সেকাল’, ‘কুহুধ্বনি’ প্রভৃতিতে কবির বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগ-অনুভব। ‘সোনার তরী’র ‘পুরস্কারেও দেখি, ভাবাবিষ্ট কবি গেয়ে চলেছেন “পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি রাঘবের ইতিহাস’ এবং ‘কুরুপাণ্ডব সমরবারতা!’ জীবনের গভীর কথাগুলি কোনদিন পুরোণো হয় না।

“সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহাসংগীতে
বাজে মানবের কাণে।”

বর্ষা, শরৎ, শীত, বসন্ত চিরদিন সাজিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতিকে আর চিরকালই হাসি-অশ্রুর ঢেউ-দোলায় দুলছে মানুষের মন!

"এমনি বরষা আজিকার মত
কতদিন কত হ'য়ে গেছে গত",

তাই নূতনের উপরে পড়ে পুরাতনের ছায়া। বর্ষারাত্রে শুয়ে শুয়ে

"পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে'
মন-সুখে নিদ্রায় মগন—
সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে
রাধিকার নির্জন স্বপন।" —'বর্ষাযাপন'।

১৪

'সোনার তরী' নিয়ে সাহিত্য সভায় একদিন বাদ-প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। এর বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। এমন অভিযোগে কবির নিরুত্তর থাকাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। অন্তরের আবেগ-বশে তিনি লেখেন কবিতা, কার কাছে তার অর্থ স্পষ্ট হবে, কার কাছে হবেনা, সে চিন্তার তখন অবসর কোথায়? বন্ধুদের উপহাস তাঁর হৃদয়ে যে ভাব জাগিয়েছিল, বিনয়-নম্র ভাষায় তিনি তা ব্যক্ত করেছেন 'চিত্রা'র 'সাধনা' কবিতায়। বিরূপ মন্তব্যে ব্যথা পেলেও তিনি আত্মবিশ্বাস কখনও হারান নি। আপন সাধনার পথ তাঁর সম্মুখে প্রসারিত, চিত্তের দ্যুতিতে সে পথ সমুজ্জ্বল। 'অনাদৃত' কবিতায় আছে তাঁর মনোগত আশার প্রকাশ।

"বোধ হচ্ছে, এ কবিতাটি যিনি লিখেছেন, তিনি মনে করছেন তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠক-মণ্ডলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাব গ্রহণ করতে পারবেনা, তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়, অতএব, এখনকার মত এ সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে—তোমরাও অবহেলা করো,

আমিও অবহেলা করি, কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে, তখন 'পস্টারিটি' এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার আক্ষেপ কি মিটবে ?" —'ছিন্নপত্র'।

বস্তুতঃ সাধনার ফল তিনি জীবনকালেই পেয়েছেন পস্টারিটি'র অপেক্ষায় তাঁকে ব'সে থাকতে হয়নি।

খেয়া

১

'সোনার তরী' আর 'খেয়া'—প্রায় বারো বছরের ব্যবধান। বাংলা ১৩১৩, ইংরেজী ১৯০৬-এ 'খেয়া'র প্রথম প্রকাশ। কবির সাংসারিক জীবনে এবং অন্তর্জীবনে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। 'খেয়া'-রচনার কিছুদিন আগে (১৩০৯ সালে) তিনি চিরতরে হারিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে এবং একটি কন্যাকে। তাই মনে জাগছে 'শেষ খেয়া'র কথা। দেহ মন বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল। আসুক মরণের বিশ্রাম। সংসারের কাজকর্ম চুকিয়ে তিনি ঘাটে এসে বসে আছেন, কিন্তু

> "ডাকলে আমি ক্ষণেক থামি' হেথায় পাড়ি ধরবে সে
> এমন নেয়ে আছে রে কোন্ নায় ?"

ঘুমের দেশের "ঘোমটা পরা ছায়া" মন ভুলিয়েছে তাঁর। আপন জন যারা ছিল, চল্‌ল একে একে। পরলোকযাত্রীদের মধ্যে কে ছিল আপন, আজ আর চেনবার উপায় নেই। কত তরী ঐ দূর দিগন্তে চলেছে নিঃশব্দে।

> "কেমন করে' চিন্‌ব ওরে ওদের মাঝে কোন্‌খানা
> আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে।"

রহস্যময় পরলোক—ছায়াস্নিগ্ধ, আধ-আলো আধ-অন্ধকারের দেশ। ঐ দেশে যাবার জন্য কবি উৎসুক, অথচ তাঁকে ডেকে নেয়না কেউ। ইহজীবন হ'লনা তাঁ'র সুখে সৌভাগ্যে সার্থক, নেই তার "ফুলের বাহার", মৃত্যুও এলোনা "শেষ পরিপূর্ণতা" নিয়ে, "ফল্‌লনা ফসল"। ব্যথা তাঁ'র এত গভীর, চোখের জলে তা'কে প্রকাশ করতে যাওয়া

হাস্তকর। "বেলাশেষের শেষ খেয়া"র প্রতীক্ষায় তিনি বসে আছেন অধীর আগ্রহে।

শেষ কবিতা 'খেয়া'তেও একই সুর :

"ভাঙিলে হাট দলে দলে
সবাই যবে ঘাটে চলে
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই খেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।"

২

'সোনার তরী' এনেছিল শুধু সৌন্দর্যস্বপ্ন, 'খেয়া' আনবে বিশ্রামের আশ্বাস, পরলোকের ডাক।

"তুমি এপার ওপার কর কেগো
ওগো খেয়ার নেয়ে,
আমি ঘরের দ্বারে বসে' বসে'
দেখি যে তাই চেয়ে।"

যতদিন 'শেষ খেয়া' না আসে, ততদিন সংসারে থেকেও কবি থাকতে চান সংসারের বাইরে, কর্মকোলাহল থেকে দূরে। কিছুকাল পূর্বে তাঁ'র জীবনে ছিল কর্মের প্রবল উদ্দীপনা। 'নৈবেদ্যে' পাই তার পরিচয়। আজ মন শান্তিপিয়াসী। এ শান্তির আকাঙ্ক্ষা এসেছে নানা কারণে। হয়তো স্ত্রী এবং কন্যার মৃত্যু প্রধান কারণ। তা ছাড়া, কর্মের উত্তেজনায় এসেছিল ক্লান্তি, অশ্রান্ত চাঞ্চল্যের মধ্যে হৃদয় পায়নি তৃপ্তি। বিক্ষোভ প্রকাশকেই অনেকে দেশসেবার একমাত্র

উপায় মনে করতেন, রবীন্দ্রনাথের মন তাতে সায় দেয়নি। সুহৃৎকর্মীদের কাছ থেকে তিনি চেয়েছেন বিদায় :

"বিদায় দেহ, ক্ষম আমায় ভাই
কাজের পথে আমি ত আর নাই।
এগিয়ে সবে যাওনা দলে দলে
জয়মাল্য লওনা তুলি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিয়োনা ভাই।"

'কল্পনা'র যুগে যিনি সংগ্রামের আদর্শ গ্রহণ ক'রে বলেছিলেন "মানিবনা বন্ধন ক্রন্দন, হেরিবনা দিক্, গণিবনা দিনক্ষণ, করিবনা বিতর্কবিচার, উদ্দাম পথিক" তাঁ'রই কাছ থেকে শুনি আজ বিদায়ের বাণী। বিরামকে উপেক্ষা ক'রে 'অশেষের' আহ্বানে সেদিন যিনি সাড়া দিয়েছিলেন, আজ তিনি বলছেন :

"রত্ন খোঁজা রাজ্য ভাঙা গড়া
মতের লাগি দেশ বিদেশে লড়া"
—"সে সব মিছে হয়েছে মোর কাছে।"

৩

পশ্চিম আকাশের সোনালী মেঘের মত হৃদয়ে জাগে মরণের স্বপ্ন। কতদূরে আছে শান্তির আর সুপ্তির দেশ, চিররহস্যের ছায়া দিয়ে ঘেরা। সে দেশে যাবার দিন আসেনি তো আজও।

ক্লান্ত দেহ মন চেয়েছিল অবকাশ, নিশ্চিন্ত অবসর। সে অবকাশ মিলল পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে। আকাশ বাতাস উদার স্নেহস্পর্শে জুড়িয়ে দিল জ্বালা।

পল্লীর রূপ রবীন্দ্রনাথ অনেক এঁকেছেন. কিন্তু 'খেয়ার' চিত্রগুলির মত চিত্র বোধ হয় তাঁ'র রচনাতেও বেশী নেই। 'ঘাটের পথ', 'কুয়ার ধারে', 'বৈশাখে', 'দীঘি', 'গান শোনা'—যেটিই পড়ি. স্মৃতি-রঙিন ছবিগুলি মনের পটে আঁকা হয়ে যায়। আর. সুরের প্রবাহে, অবিচ্ছিন্ন ভাবাবেগে অপরূপ গীতিমাধুরী হৃদয় অধিকার ক'রে নেয়। হয়তো কোন কোন কবিতায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত হ'য়েছে আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে, কিন্তু কোথাও ছবি অস্পষ্ট হয়নি বা তত্ত্বের আড়ালে ঢাকা পড়েনি। মনে হয়, কাব্যখানি যেন স্বচ্ছ সরোবর. মৃদু বাতাসে উঠেছে ছলছল ঢেউ, আর সন্ধ্যারশ্মি নেমে গিয়েছে তার গভীর মর্মতলে। অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে সহজে পৌঁছেছে ভাবের আলো।

৪

উৎসর্গপত্রে কবি লজ্জাবতী লতার সঙ্গে 'খেয়া'র কবিতাগুলির তুলনা ক'রেছেন। তেমনি সহজ-কুণ্ঠিত, কিন্তু স্পর্শ করলেই প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। বিষয় সামান্য, পল্লীর অনাড়ম্বর দৃশ্য. ক্ষুদ্রক্ষুদ্র সুখদুঃখ ; জীবনের উদ্দাম আবেগ নেই এখানে, আছে হৃদয়ের নিভৃত কম্পন. উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা নেই, আছে মমতা-করুণ স্নিগ্ধ শ্রী।

দিনান্তে যেমন পৃথিবীর মুখে ফুটে ওঠে কোন্ অপার্থিব মায়া, তেমনি এ কাব্যে পরলোকের আভা লেগে জীবনের রূপ হয়েছে বিস্ময়কর। অনেক কবিতাতেই পাই প্রকৃতির সুন্দর চিত্র ; সে চিত্র কবি দেখেছেন বিদায়োন্মুখ মন নিয়ে, কতকটা উদাসীন ভাবে।

'গীতাঞ্জলি' লেখা হয় 'খেয়া'র পরে। তাতে এমন শূন্যতা-বোধ নেই, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হৃদয়ে এনে দিয়েছে পূর্ণতা। 'ঘরেও নহে, পারেও নহে'—এ ভাব একান্তভাবে 'খেয়া'র।

কবির সংসার-বন্ধন হয়েছে শিথিল; জীবনের গতিবেগ স্তব্ধপ্রায়।

"আমার চুকেছে দিবসের কাজ
শেষ হ'য়ে গেছে জলভরা আজ।"

পল্লীবধূর ঘাটে যাওয়ার দৃশ্য কবির মনে এনে দিয়েছে জীবন-পথে আনাগোনার স্মৃতি। পথ-চলায় ছিল তাঁ'র আনন্দ। কত ঝড়বৃষ্টির দিনে, যখন "বেণুশাখা 'পরে বারি ঝরঝরে, একূলে ওকূলে কালো ছায়া পড়ে", কত আঁধার সন্ধ্যায়, যখন "বাতাস থমকে জোনাকি চমকে", তখন তিনি 'ঘাটের পথ' দিয়ে গিয়েছেন জল আনতে।

"কত না দিনের আঁধারে আলোতে
বহিয়া এনেছি এই বাঁকা পথে
কত কাঁদা কত হাসা।"

বেদনার অশ্রুতে আর আনন্দের হাসিতে তিনি মনের কলসী ভরে নিয়ে এসেছেন।

"বেলা বেশি নাই, দিন হ'ল শোধ
ছায়া বেড়ে যায়, পড়ে আসে রোদ
এ বেলা কেমনে কাটে?"

উদ্দেশ্যবিহীন এই অস্তিত্ব।

বাহিরের আকর্ষণ তাঁর চিরদিনই প্রবল।

"আমি বাহির হইব ব'লে
যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে।
তাই কানাকানি পাতায় পাতায়
কালো লহরীর মাথায় মাথায়

চঞ্চল আলো দোলে।
আমি বাহির হইব ব'লে।"

আজ আর জল আনতে যাওয়া নয়। ইহলোকের সব দেনাপাওনা মিটিয়ে কবি ব'সে আছেন পারে যাবার জন্যে। "আঙিনার দ্বারে চাহি পথ পানে, ঘর ছেড়ে যেতে নারি।" 'শেষ খেয়া'তেও একই কথা। ঘরের মায়া মন থেকে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু "সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে?"

৫

প্রথম দু'টি কবিতায় সংসার ছেড়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা যত প্রবল, পরবর্তী অনেক কবিতায় তত নয়।

"আমার সারা দিনের এই কিরে কাজ
ও পার পানে কেঁদে চাওয়া?"

প্রকৃতির স্নেহস্পর্শে এবং ভগবানের কাছে আত্মনিবেদনে হৃদয় ক্রমশঃ শান্ত হ'য়ে আস্ছে।

"ওপার পানে কেঁদে চাওয়া" আর নেই, মন পেয়েছে সান্ত্বনা।

"এক রজনীর বরষণে শুধু
কেমন ক'রে
আমার ঘরের সরোবর আজ
উঠেছে ভ'রে।"—প্রভাতে।

শোকের আঘাত বড় বেজেছিল বুকে; অশ্রুবর্ষণে এসেছে শান্তি। দেবতার অমৃতস্পর্শ অনুভব করেছেন কবি। "অশ্রু সলিল মাঝে" ফুটেছে প্রেমের কমল। প্রেমময়ের সঙ্গে হ'ল নূতন পরিচয়।

"আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী,
তোমারে তবু চিনিব আমি

*　　*　　*

যেমন ক'রে দেওনা দেখা
তোমারে নাহি ডরিব হে।"—দুঃখমূর্তি।

ভালো লাগেনা সংসারের জটিলতা। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতের রূপমাধুরী, প্রভাত-সন্ধ্যার বর্ণরাগ মুহূর্তে কেড়ে নেয় মন। সকল সৌন্দর্য স্মরণ করিয়ে দেয় সৌন্দর্যময়কে।

"আমি কেমন করিয়া জানাবো, আমার
জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো—আমার
জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে।
আমি কেমন করিয়া জানাবো, আমার
হৃদয় কি নিধি কুড়ালো—ডুবিয়া
নিবিড় নীরব শোভাতে।"—মিলন।

ভোরের আলোক-বিকাশ দেখে মনে হয়, এমনি ক'রে যদি "অন্তরে যা ডুবে আছে" সব "আলোক পানে" তুলে ধরতে পারতাম! নিখিল-বীণায় বিশ্বদেবতার করস্পর্শে জাগে বিচিত্র সুর। তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গাইতে সাধ হয় কবির।

"তোমার বীণার সাথে আমি
সুর দিয়ে যে যা'ব
তারে তারে খুঁজে বেড়াই
সে সুর কোথায় পা'ব।"—বিচ্ছেদ।

বীণার রূপকে না ব'লে কখনওবা ঐ কথাই বলেন বাঁশির রূপকে।

"ঐ তোমার ঐ বাঁশিখানি
শুধু ক্ষণেক তরে
দাও গো আমার করে।"—বাঁশি।

৬

প্রিয়জনের বিয়োগ ও-পারের কথা মনে করিয়ে দিলেও এপারের টান কবির মন থেকে একেবারে যায়নি। পৃথিবীর রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ চিরদিন আকুল ক'রেছে তাঁ'কে। এমন কি, "উসুখুসু শব্দটুকুস্ কোটর মাঝে কীটের খেলার"—তাও তাঁ'র গানের সুরে ধরা দিয়েছে।

"আজ কি আমায় গাইতে হবে
নীল আকাশের নির্জন গান?
নীড়ের বাঁধন ভুলে গিয়ে
ছড়িয়ে দেব মুক্ত পরাণ?"

না, দুঃখ বেদনা সত্ত্বেও
"তবু নীড়েই ফিরে আসি,
এম্‌নি কাঁদি, এম্‌নি হাসি,
তবু-ও এই ভালোবাসি
আলো ছায়ার বিচিত্র গান।"—নীড় ও আকাশ।

ব্যথার স্পর্শে জেগেছে নূতন চেতনা, দৃষ্টি প্রসারিত হ'য়েছে অসীমের পানে। ভোগের গণ্ডীতে, অভ্যাসের শৃঙ্খলে বাঁধা প'ড়ে যায় মন। শোকের মধ্য দিয়ে, বেদনার মধ্য দিয়ে আসে মুক্তি। বিশ্বকে ভুলে যখন নিজের ক্ষুদ্র আরামটুকু নিয়ে থাকি, অলক্ষিতে হারাই বৃহৎ আনন্দকে, তখনই বিশ্বদেবতা অতর্কিত আঘাতে আমাদের

ভুল ভেঙে দেন। হঠাৎ চমকে উঠে ভাবি, জীবনের সকল আলো বুঝিবা গেল নিবে। আলোক-তৃষ্ণায় অধীর হয় হৃদয়। পরে দেখি, জগৎময় ছড়িয়ে আছে আলো। আমারই সেদিকে চোখ ছিলনা। নূতন উপলব্ধি নিয়ে ব'লে উঠি : সার্থক এ আঘাত, 'সার্থক নৈরাশ্য'।

"বঞ্চিত করি' যা দিয়েছ কারে ক'ব
আমায় জগতে দিয়েছ তুলে'।"

৭

সৌন্দর্য-দৃষ্টি হয়েছে আরও স্বচ্ছ, আরও গভীর। ছোট্ট জিনিষগুলিও আজ দেখা দেয় অপরূপ হয়ে। প্রকৃতির চিত্রশালায় ব'সে তুলি নিয়ে কবি স্বপ্নবিভোর।

নির্জন দুপুরে আকাশে যেন কা'র "রিমি ঝিমি নূপুর বাজে।"

"অলস ধেনু চ'রে বেড়ায়
সারি-বাঁধা তালের বনে।"

ইন্দ্রিয়-চেতনার বিচিত্র সূক্ষ্ম ঊর্মি বহন ক'রে আনে কোন্ ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। সে অনুভূতির কি কোন ভাষা আছে? কবির কাব্যে তাই ফুটে ওঠে অনন্ত ইঙ্গিত, ইশারা, অনির্বচনীয়ের সঙ্কেত,—রোমান্টিক আকুলতা।

"ঘন মহুল শাখার মত
নিঃশ্বাসিয়া উঠিছে প্রাণ,
গায়ে আমার লেগেছে কার
এলো চুলের সুদূর ঘ্রাণ।"—বৈশাখে।

মধ্যাহ্নকালের স্বপ্নাবেশ আকাশে আঁকে মরীচিকা-ছবি, হৃদয়ে জাগায় কি-যেন না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস, দূর থেকে নিয়ে আসে কার আকুল-করা কেশ-সৌরভ!

সারাদিন কাটে প্রকৃতির এই রূপ-রাজ্যে। সন্ধ্যা ঘনায়, ঘরে ফেরবার তাগিদ নেই। বধূর জল-ভরা দেখে মন চুপি-চুপি প্রশ্ন করে :

"সারাদিনের অকাজে আজ
কেউ কি মোরে দেয়নি ধরা ?
আমার কি মন শূন্য, যখন,
হ'ল বধূর কলস-ভরা ?"

পাঠকের মনে পড়বে "ঘাটের পথ"-এর কথাগুলি :

"আমার চুকেছে দিবসের কাজ
শেষ হ'য়ে গেছে জলভরা আজ।"

সাংসারিক দেনা পাওনার হিসাব হয়তো শেষ ক'রেছেন কবি, কিন্তু প্রকৃতির অমৃত-সরোবর থেকে হৃদয় কি আজও ভ'রে নেয়না কলসী ? তা'র রৌদ্রে জ্যোৎস্নায়, আলোয় ছায়ায় তাঁ'র মন হয় আগেরই মত চঞ্চল।

দিনান্তে জাগে মোহন স্বপ্ন ছবি :

"আজিকে চাঁদ উঠবে প্রথম রাতে
নদীর পারে নারিকেলের বনে,
দেবালয়ের বিজন আঙিনাতে
পড়বে আলো গাছের ছায়া সনে।
দখিন হাওয়া উঠবে হঠাৎ বেগে
আসবে জোয়ার সঙ্গে তারি ছুটে
বাঁধা তরী ঢেউয়ের দোলা লেগে
ঘাটের' পরে মরবে মাথা কুটে।"

তাঁ'র 'বাঁধা তরী'—সংসার থেকে বিদায়-নেওয়া মন—তাও কি

ঐ জ্যোৎস্নার মদির স্পর্শে, অনির্বচনীয় অনুভূতির আবেগে থর থর ক'রে উঠবেনা কেঁপে ?

৮

অতল শান্তির মধ্যে ডুব দিতে চায় কবির মন। তাই তো 'কুয়ার ধারে' তাঁ'র আলস-ভরে ব'সে থাকা, 'দীঘি'র জলে অবগাহন করবার সাধ। একাব্যে নেই সমুদ্রের তরঙ্গ-দোলা। একবার মাত্র মনে পড়েছে সমুদ্রের কথা—মরণ-সমুদ্রের ; কবি দু'হাত মেলে নিতে চেয়েছেন "অন্তবিহীন অজানাকে"। বিরাম, বিশ্রাম, প্রকৃতির লীলা-মাধুরী উপভোগ—এসব কি জীবন-সাধনার বিরোধী ? না, তা নয়। ভগবান্ শুধু শক্তির দেবতা ন'ন, প্রেমেরও দেবতা। রসো বৈ সঃ। তাঁ'র বিচিত্র সৃষ্টির রসাস্বাদনও তাঁ'র পূজা। "পৌষফাগুনের পালার" মধ্যে কবি "গানের ডালা" বইবেন, এই তো তাঁ'র দেবতার 'খুশি,' তাই তো তিনি মালা পরিয়ে দিয়েছেন কবির কণ্ঠে।

কাজের লোকেরা গেল কাজের পথে, "কলস নিয়ে" চলে গেল পাড়ায়। কবি ব'সে রইলেন আনমনে কুয়োর ধারে। প্রিয়দেবতা সেখানেই দিলেন দেখা।

"তৃষ্ণাকাতর পান্থ আমি'
শুনে চমকে উঠে
জলের ধারা দিলেম ঢেলে
তোমার করপুটে।"

দেবার মতন বেশী কিছু ত' ছিলনা তাঁ'র। "তোমার মনে থাকার মত ক'রেছি কোন্ কাজ ?" তবু দেবতা প্রকাশ করলেন প্রসন্নতা, কবির মন ভ'রে গেল তৃপ্তিতে। রূপের লীলায়, রসের লীলায় ভগবান চান আমাদের সঙ্গীরূপে, আমাদের ভালোবাসা পাবার তৃষ্ণা তাঁ'র।

এই কবিতার আলোচনা-প্রসঙ্গে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উল্লেখ ক'রেছেন একটি খ্রীষ্টীয় কাহিনীর এবং তদ্বিষয়ক চিত্রের। কয়েকটি নারী কুয়ো থেকে জল তুলছিল, পথশ্রান্ত যীশু এসে বসে পড়লেন সেখানে। অনেকেই জল ভ'রে নিয়ে চলে গেল, কেউ তাঁকে জল দিল না। অবশেষে একটি মেয়ে এগিয়ে এলো করুণার্দ্র হৃদয়ে। তাঁকে জল পান করিয়ে লাভ করল পরম আনন্দ।

... ...

'নিরুদ্যম' কবিতাতেও একই ভাব। কবির মনে ছিল সংকোচ, কারণ, কর্মজীবন থেকে তিনি নিয়েছেন বিদায়। সঙ্গীরা গেছে এগিয়ে।

"লাজের ঘায়ে উঠিতে চাই,
মনের মাঝে সাড়া না পাই,
মগ্ন হ'লেম আনন্দময়
অগাধ অগৌরবে
পাখীর গানে, বাঁশীর তানে
কম্পিত পল্লবে।"

তবু অবসর-ক্ষণের আনন্দে ধরা দিলেন দেবতা।

"চেয়ে দেখি, কখন এসে
দাঁড়িয়ে আছ শিয়রদেশে
তোমার হাসি দিয়ে আমার
অচৈতন্য ঢাকি'।"

... ...

'দীঘি'র "গভীর ঘন কালো শীতল জলরাশি" স্নিগ্ধ ক'রে দেবে দেহমন।

"ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মত যেন
অঙ্গ ওঠে ভ'রে।"

মৃত্যুর অগাধ শান্তি স্মরণ করিয়ে দেয় কি ঐ দীঘির জল ?

"ছায়ানিচোল দিয়ে ঢাকা মরণভরা তব
বুকের আলিঙ্গন
আমায় নিল কেড়ে নিল, সকল বাঁধা হতে
কাড়িল মোর মন।"

৯

উদার আকাশ বাতাস নিত্য অমৃতবর্ষণ করে যাঁর চিত্তে, তিনি আর কিসের পিপাসায় হবেন অধীর ?

"হৃদয় আমার গেছে ভেসে
চাইনে-কিছুর স্বর্গশেষে,
ঘুচে গেছে এক নিমিষে
সকল পিপাসা।"—বর্ষা প্রভাত।

ছায়া-ঘেরা এই গ্রাম—এই স্বপ্ন জগৎ—'সব-পেয়েছির দেশ'। ধন, মান, রাজ্য, ঐশ্বর্য এখানে তোলেনা আকাঙ্ক্ষার আবর্ত।

"নাইক' পথে ঠেলাঠেলি,
নাইক' হাটে গোল,
ওরে কবি, এইখানে তোর
কুটীরখানি তোল্।"—সব পেয়েছির দেশ।

আগেও কবির দু'একবার সাধ হয়েছে পল্লীর শীতল কোলে আশ্রয় নেবার। তিনি বলেছেন :

"নেমেছে নীরব ছায়া ঘনবনশয়নে
এদেশ লেগেছে ভালো নয়নে।"—দিনশেষে ; চিত্রা।

কিন্তু সেদিনের চেয়ে আজ তাঁর শান্তিকামনা আরও নিবিড়, আরও গভীর।

মাঝে মাঝে দুঃখ হয়, বর্তমান কালের অধীর উন্মত্ততায় এ শান্তিময় জীবনকে আমরা দিচ্ছি বিদায়। 'কোকিল'-এর গান শুনে মনে পড়ে,

"বাংলা দেশে ছিলাম যেন
তিনশো বছর আগে।"

আর কি আছে সেই "গোলায় ভরা ধান," "নারীর কণ্ঠে হাসির কলতান," "তারার আলোয় পুরাণ কথা"—কওয়া?

"শহর থেকে ঘণ্টাবাজে
সময় নাইরে হায়
ঘর্ঘরিয়া চলিছে আজ
কিসের ব্যর্থতায়!"—কোকিল।

১০

পল্লীর প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে কখনও বা দেখা দেয় ক্ষণিক চাঞ্চল্য। 'ঝড়' আসে মৃদঙ্ বাজিয়ে। দূর-দুরান্তর থেকে কা'রা ছুটে আসে "বৃষ্টিধারার স্রোতে।" কবির হৃদয় ওঠে মেতে।

"ঝড়ের 'পরে পরাণ আমার
উড়ায় উত্তরীয়।"

ভাবের, চিত্রের, সুরের একমুখীনতায় 'ঝড়' একটি চমৎকার গীতি-কবিতা। সুবিখ্যাত 'বর্ষশেষ' এমন গাঢ়বন্ধ, এমন ঋজুগতি নয়। তত্ত্বে ও চিত্র-বাহুল্যে 'বর্ষশেষ' অপেক্ষাকৃত ভারাক্রান্ত।

কোনও কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে যখন "সাড়া কারও নাইরে, সবাই ঘুমায় অকাতরে" তখন কবির চোখে হয়তো আসেনা ঘুম। তিনি ভাবেন,

গ্রামের এই অলস নিশ্চেষ্ট জীবনে কোন দিন কি আসবেনা পরিবর্তন? দেখা দেবেনা যুগান্তর, জাগবেনা জীবনের সাড়া?

"ওরে নিদ্রাবিহীন আঁখি
ওরে শান্তিহারা
আঁধার পথে চেয়ে চেয়ে
কার পেয়েছিস সাড়া?"—জাগরণ।

পল্লীবধূর সংকোচ-কুণ্ঠিত সরল মুখের পানে তাকিয়েও কবির মনে আসে যুগান্তরের কথা। চক্রমুখর আধুনিক সভ্যতার রথ আজও পৌঁছয়নি তার দ্বারে, তাই আজও সে রয়েছে তার নিভৃত স্বপ্নজগতে।

"ছায়াময় সে ভুবনখানি
স্বপন দিয়ে গড়া
রূপকথাটি ছাঁদা,
কোন্ সে পিতামহীর বাণী
নাইকো আগাগোড়া
দীর্ঘ ছড়া বাঁধা।"

কিন্তু "জগৎ যদি এক নিমেষে শক্তিমূর্তি ধ'রে" তার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, তবে

"কোথায় থাকে আধেক ঢাকা
অলস দিনের ছায়া,
বাতায়নের ছবি,
কোথায় থাকে স্বপন-মাখা
আপন-গড়া মায়া
উড়িয়া যায় সবি।"—অনাহত।

চুড়ি-ওয়ালার প্রতীক্ষারত পল্লীবধূর ছবিখানি যেমন আকর্ষণ করে মনকে, তেমনি কল্পনার নূতনত্ব জাগায় চমক।

১১

প্রেম, প্রীতি, আসক্তি,—শোকের দিনে অনেক সময়ে মনে হয় নিরর্থক। আমরা যাকে উৎসর্গ করতে চাই আমাদের বুকভরা ভালোবাসা, সে হয়তো উদাসীন। যে আমাদের কুটীরে এসে আপন হাতে সন্ধ্যাপ্রদীপটি জ্বালিয়ে দিলে জীবন হ'ত ধন্য, সে চ'লে যায় আকাশ প্রদীপ দিতে। "কেহ নহে তোমার আমার"। 'অনাবশ্যক' ফেলাছড়াই বুঝি প্রকৃতির নিয়ম।

... ...

যদি শান্তি চাই, নিজেকে সঁপে দিতে হবে জীবন-দেবতার কাছে। দোষ ত্রুটি ক্ষমা ক'রে তিনি গ্রহণ করবেন আমাদের। তিনি আমাদের স্বামী, আমরা অবোধ 'বালিকাবধূ'।

রবীন্দ্রনাথের ভগবৎপ্রেমের কবিতায় প্রায়ই লেগেছে বৈষ্ণব ভাবরসের স্পর্শ। ভগবান আমাদের স্বামী, আমাদের প্রণয়ী, এ কল্পনা ছড়িয়ে আছে অনেক কবিতায়। বৈষ্ণবগণ রাধাকৃষ্ণলীলাকে কতকটা প্রত্যক্ষ রূপ দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তার মরমী সুরটুকু মাত্র নিয়ে কবিতায় সঞ্চার করেছেন অলোক-রাজ্যের ছায়াভাস। তবু 'বাঁশি' পড়তে গিয়ে রাধিকার 'বংশী-শিক্ষা' মনে পড়ে, 'বাসকশয়ন' তাঁর বাসক-সজ্জা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'লীলা' নামটিতেও লীলাবাদের আভাস পাই।

ভগবানের সাধ-আমাদের নিয়ে খেলবেন, তাই তাঁর আকাশ-কোণে "শরৎ শেষের মেঘের মত" আমরা আসি, "বর্ণে বর্ণে" সাজিয়ে

আমাদের "বায়ুর স্রোতে ভাসিয়ে" দেন তিনি। যেদিন তাঁর ইচ্ছা হবে, সেদিন এই খেলা হবে শেষ।

"রেখাবিহীন মুক্ত আকাশ
হাসবে চারিধারে
মেঘের খেলা মিশিয়ে যাবে
জ্যোতিঃ সাগর পারে।"—*লীলা*।

মেঘের সঙ্গে আমাদের জীবনের তুলনা 'মেঘ' কবিতাতেও আছে। আকাশ নির্বিকার। "পড়ে আছে * * * খোষ খেয়ালি," তারই বুকে "মেঘের পুঞ্জ" ভেসে আসে, ভেসে চ'লে যায়। অসীমের বুকে আমাদের আসা-যাওয়াও তেমনি। স্মরণীয়—ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের কবিতা:

"Like trailing clouds of glory do we come
From God who is our Home."

"গৌরবদীপ্ত মেঘমালার মত আসি আমরা ভগবানের কাছ থেকে; তিনিই আমাদের গৃহ।"

১২

বৈষ্ণব ভাব, মধুররূপে ভগবানের কল্পনা, শান্তি-আকাঙ্ক্ষা 'খেয়া' কাব্যে প্রাধান্য লাভ করলেও কবি ভোলেননি—যে, শুধু কোমলতা জীবন-গঠনের উপাদান নয়, কেবল সৌন্দর্য-সাধনার মধ্যে জীবনের পূর্ণতা নেই। দেবতার দান দুরূহ কর্তব্যভার, তাঁর আহ্বান শক্তির আহ্বান। তাঁর গলার মালাটি কুড়িয়ে নিতে গিয়ে কবি দেখেন, "এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি।" তাঁর 'আগমন' ঘোষিত হয় বজ্র গর্জনে, বিদ্যুৎ ঝলকে।

১৩

কর্মময় দিনগুলি এসে কবে চ'লে গেছে। দেশের সেবায় কবি উৎসর্গ করেছিলেন নিজেকে। রূপকথার রাজপুত্রের মত' জীবন-দেবতা সেদিন অপূর্ব মহিমায় অকস্মাৎ দেখা দিয়েছিলেন ক্ষণেকের জন্য। প্রভাতের আলোয় ঝলমল ক'রে উঠেছিল তাঁ'র 'স্বর্ণ-শিখর-রথ'। এম্‌নি ক'রেই তিনি আসেন কোনও অতর্কিত মুহূর্তে। তখন যদি আমাদের অন্তরের অর্ঘ্য—বক্ষের মণি—না দিতে পারি তাঁকে, তবে বৃথা আমাদের জীবন। আমাদের যে-টুকু দেবার আছে, যেন তাঁকে নিঃশেষে দিই, ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখি।

"মোর হার ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে"

কালের রথে অক্ষয় হ'য়ে না-ই বা রইল আমাদের দান, না-ই ঘোষিত হ'ল কীর্তি-কথা, দেবতার আবির্ভাবের 'শুভক্ষণটিকে অবহেলা করিনি, এই হবে আমাদের সান্ত্বনা। 'চিত্রা'র কবি তাঁ'র হৃদয়-দেবতাকে নিবেদন ক'রেছিলেন তাঁর 'সাধনা'র ফল, এখানে—'শুভক্ষণ'-এ উপহার দিয়েছেন 'বক্ষের মণি'। লোকের কাছে নগণ্য হ'লেও এই তো তাঁ'র পরম সম্পদ্‌।

'শুভক্ষণ'-এর সঙ্গে 'আগমন' কবিতার ভাব-গত যোগ রয়েছে। এতেও দেবতার আকস্মিক আবির্ভাবের কথা। তিনি আসেন মধ্য-রাত্রে আমাদের ঘুম ভেঙে দিয়ে। কেউ বা ওঠে ভয়ে কেঁপে, কেউবা 'ছিন্ন শয়ন টেনে এনে আঙিনা' সাজায়। 'দুঃখ-রাতের রাজা'কে যে চিন্‌লনা, সে হতভাগ্য। এ ভাবের বহু কবিতাই আমাদের মনে পড়বে—কল্পনার 'দুঃসময়', বর্ষশেষ', 'অশেষ', ক্ষণিকার 'আবির্ভাব', বলাকার 'শঙ্খ' প্রভৃতি। 'রাজা' নাটকের কথাও মনে আসবে—

কেননা, দুঃখের মধ্য দিয়ে ভগবানের সঙ্গে প্রকৃত মিলনের কথাই তা'র প্রতিপাদ্য। বিশেষ ক'রে 'আঁধার ঘরের রাজা' এই বাক্যাংশ মনে আনবে 'রাজা' নাটকের ইংরেজী অনুবাদের নাম—"The King of the Dark Chamber." জাতীয় সঙ্গীতেও কবি কি বলেননি, বিপ্লবের মধ্যে বাজে তাঁর শঙ্খধ্বনি, দুঃস্বপ্ন ও আতঙ্কের মধ্যে তিনি দেন আশ্রয় ?

কর্মজীবন থেকে ক্লান্ত মনে বিদায় নিতে চাইলেও কর্মময় জীবনাদর্শের প্রতি কবির শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ। দেবতার কাছে আজ তিনি শান্তি ও বিরাম প্রার্থী, কিন্তু তিনি জানেন, দুঃখের পথে, সংগ্রামের পথে বারে বারে বাজে তাঁ'র আহ্বান।

'পথিক' কা'কে উদ্দেশ ক'রে লেখা ? গৃহসুখ ছেড়ে যে কর্মী তাপস দুর্গম বন্ধুর পথে বেরিয়ে পড়তে উৎসুক, তাকে ? 'কল্পনা'র 'দুঃসময়ে' কবি নিজেকে তুলনা করেছিলেন দূরযাত্রী পাখীর সঙ্গে, বলেছিলেন, হয়তো আপনজনে পিছু ডাকবে,

> "বহুদূর তীরে কা'রা ডাকে বাঁধি' অঞ্জলি
> 'এসো এসো' সুরে করুণ মিনতি মাখা"
> কিন্তু পাখী আর ফিরবেনা তার নীড়ে।

'পথিক'-এর ভাব কি অনুরূপ ? সঙ্গীরা মিনতি-কাতর কণ্ঠে বলে :

> ' মোদের ঘরে হয়েছে দীপ জ্বালা
> বাঁশির ধ্বনি হৃদয়ে এসে লাগে

* * *

> বিদায় বেলা এখনি কিগো হবে,
> পথিক ওগো পথিক, যাবে তবে ?"

তা'রা স্মরণ করিয়ে দেয়:

"এখন এ যে গভীর ঘোর নিশা।
নদীর পারে তমাল-বন-ভূমি
গহন ঘন অন্ধকারে মিশা।"

কিন্তু পথিক যে প্রস্তুত!

"তোমার ঘোড়া রয়েছে সাজি প'রে
বাহিরে দেখ দাঁড়ায়ে তব রথ।"

কর্মীর কঠিন কর্মপথে যাত্রার গৌরবময় চিত্রই কি কবি আঁকতে চেয়েছেন? শোক, ক্লান্তি এবং কর্মীদের মধ্যে অনেকের নিষ্ঠার অভাব কবিকে পথিক-দলের সঙ্গী থেকে দূরে নিয়ে গেলেও পথ-যাত্রার আকর্ষণ তাঁ'র অন্তরে আজও জাগরূক।

অথবা, কবি কি নিজেকেই কল্পনা করছেন পথিকরূপে? আজ সংসারের আমোদ প্রমোদে মন লাগেনা তাঁর, তিনি শুনেছেন বহু দূরের আহ্বান। মিলন-সভার আলোয় ভোলেনা তাঁ'র চোখ, বাইরের অন্ধকার উন্মনা করে তাঁকে। সঙ্গীরা অবাক্ হয়ে বলে:

"সপ্তঋষি গগনসীমা হ'তে,
কখন কি যে মন্ত্র দিল পড়ি,'
তিমির রাতি শব্দহীন স্রোতে
হৃদয়ে তব আসিল অবতরি'।
বচনহারা অচেনা অদ্ভুত
তোমার কাছে পাঠাল কোন্ দূত?

এই অচেনা অদ্ভুতের আমন্ত্রণে পরলোকের পথে যাত্রা করবার জন্য তিনি উন্মুখ? সেই পথে যাবার রথই কিঅপেক্ষা করছে দুয়োরে?

১৪

কর্মে অথবা বিশ্রামে কখনও বাইরের অনুষ্ঠান কিংবা উপকরণ কবির কাছে বড় হ'য়ে দেখা দেয়নি। অন্তরের পূর্ণ বিকাশ তাঁ'র লক্ষ্য। জন্মে মরণে, সুখে দুঃখে, সংগ্রামে আরামে অন্তরবাসী দেবতা আমাদের চিরসঙ্গী, তিনিই জীবনের নিয়ন্তা। সাধনার পরিবর্তে যা'রা উত্তেজনাকে সম্বল ক'রে চলেছে, তা'রা ভ্রান্ত। কেবল চীৎকারে, কোলাহলে জাগানো যাবেনা দেশকে। যাঁরা প্রেমিক, যাঁরা সাধক তাঁদের স্পর্শে পুষ্পের মত বিকশিত হয় আমাদের হৃদয়। অপরের শত বক্তৃতাতেও তা হয় না।

"যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে
অম্‌নি যেন পূর্ণ প্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।"—ফুলফোটানো।

... ...

ভগবানের উদ্দেশে যা আমরা উৎসর্গ করি, তাই হয় সার্থক। বিশ্বের অধীশ্বর হয়েও তিনি আমাদের প্রেমের ভিখারী। আমাদের ভালোবাসার ক্ষুদ্রতম দানটুকু'ও তিনি গ্রহণ করেন পরম সমাদরে। তাই তো সে দানে হৃদয়ে পাই অপরূপ তৃপ্তি।

"দিলেম যা রাজ ভিখারীরে
স্বর্ণ হয়ে এলো ফিরে।"—কৃপণ।

... ...

ভুল ভ্রান্তি, ও পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অভিমুখে ক্রমশঃ

অগ্রসর হয়ে চলেছি আমরা। যুগ যুগান্তরের খেলা তাঁর সঙ্গে। ক্ষয়-ক্ষতি ছিন্ন ক'রে দেয় আসক্তিবন্ধন, বাধা-বিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঘটে আমাদের শক্তির বিকাশ।

"হেরে তোমার করব সাধন
ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বাঁধন
শেষ দানেতে তোমার কাছে
বিকিয়ে দেব আপনারে।"—হার।

... ...

তাঁ'কে ভুলে যখন নিজেকে বড় ক'রে তুলতে চাই, তখন দেখি, কঠিন শৃঙ্খলে বন্দী করে ফেলেছি নিজেকে। তাঁ'র কাছে আপনাকে সঁপে দেওয়াই তো মুক্তি।

"ভেবেছিলেম আমার প্রতাপ
করবে জগৎ গ্রাস,
আমি র'ব একলা স্বাধীন
সবাই হবে দাস।
তাই গড়েছি রজনী দিন
লোহার শিকলখানা,
কত আগুন, কত আঘাত
নাইকো তার ঠিকানা।
গড়া যখন শেষ হয়েছে
কঠিন সুকঠোর
দেখি আমায় বন্দী করে
আমারি এই ডোর।"—বন্দী।

১৫

দার্শনিক ভাব, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের সকল কাব্যের মত 'খেয়া'তেও আছে, কিন্তু এ কাব্যে সহজ সৌন্দর্যানুভূতি, পল্লী প্রকৃতির শান্ত সুন্দর রূপ প্রকাশ পেয়েছে অবারিতভাবে। ছবির পরে ছবি—আবেগের রং মাখানো—অনায়াসে জয় ক'রে নেয় পাঠকের মন।

"যেমন সহজ ভোরের জাগা
স্রোতের আনাগোনা
যেমন সহজ পাতায় শিশির
মেঘের মুখে সোনা,

* * *

খুঁজে মরি তেম্‌নি সহজ
তেম্‌নি ভরপূর
তেম্‌নিতর অর্থ ছোটা
আপনি ফোটা সুর।"—বিচ্ছেদ।

"আপনি-ফোটা সুর"—তাই কবিতাগুলির আবেদন এমন বাধা-হীন। তাত্ত্বিকতার জালে মনের কথা অনেক সময়ে প্রকাশের পথ খুঁজে পায়না। প্রকাশ পেলেও পায় বাঁকা পথে। সেখানে বাইরের ভাষা হয় ভারী, মর্মের ভাষা পড়ে চাপা। এ কবিতাগুলিতে তেমন হয়নি। এ যেন হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত বাণী, স্বচ্ছ উৎস-ধারার মত এর অবাধ উৎসার। সৌন্দর্যপিপাসু পাঠক রবীন্দ্রকাব্য থেকে পাঁচখানি বই বেছে নিলেও, বোধ হয়, তা'র মধ্যে এখানি পড়বে।

রক্তকরবী

১

'রক্তকরবী'র প্রথম রচনা ১৩৩০ সালের বৈশাখে। শান্তিনিকেতনে তখন গ্রীষ্মের ছুটি। কবি ছিলেন শিলঙে। বইয়ের নাম প্রথমে ছিল 'যক্ষপুরী'। পরে পরিবর্তিত নামে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসে।

এ নাটকের কল্পনা কবির মনে অনেক আগেই জেগেছিল, অনুমান করি, ১৩২৪ সালে প্রকাশিত 'বিজয়া' কবিতা থেকে। ঐ কবিতার সঙ্গে 'রক্তকরবী'র ভাব-সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট। শক্তিমত্ত পাশ্চাত্য মানবগণ ছুটে চলেছে 'দৃপ্তবেগের বিজয়রথে।' প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাদের উদ্ধত বিদ্রোহ।

"মশাল তাদের রুদ্রজ্বালায় উঠল জ্বলে'
অন্ধকারের ঊর্ধ্বতলে

বহ্নিদলের রক্তকমল ফুটল প্রবল দম্ভভরে
দূর গগনের স্তব্ধ তারা মুগ্ধ ভ্রমর তাহার' পরে।"

মশালের আলোয় অন্ধকার দূর করবে ভেবেছে তা'রা; ভেবেছে, যন্ত্রবিদ্যার জোরে

"ছিনিয়ে লবে নিত্যকালের বিত্তরাশি
ধরিত্রীকে করবে আপন ভোগের দাসী।"

কিন্তু তাদের মশাল আলোর গৌরব-মুহূর্ত শেষ হ'য়ে আসে, ভোরের আলোয় ভেঙে যায় রাত্রির স্বপ্ন।

"আপনাকে হায় দেখছিল কোন্ স্বপ্নাবেশে
যক্ষপুরীর সিংহাসনে লক্ষ মণির রাজার বেশে।"

মনে পড়ে যায়, নাটকের প্রথম নাম 'যক্ষপুরী'। 'রক্তকরবী'র কেন্দ্রীয় চরিত্র যক্ষরাজ।

২

প্রতীকনাট্য, রূপকনাট্য, সাঙ্কেতিকনাট্য—নাম তিনটি কেউ কেউ সমার্থক বোধে ব্যবহার করেন, কেউবা ওগুলির অর্থগত সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্দেশ করেন। খানিকটা রূপকের ভাব, অর্থাৎ আপাত-অর্থের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অন্যতর ভাবব্যঞ্জনা বোধ হয় তিনটি নামেই সূচিত হয়। পার্থক্য-বিচারীরা বলেন, প্রতীকনাট্যের চরিত্রগুলি বিশেষ-বিশেষ ভাবের মূর্তি। সেখানে প্রতি চরিত্রের গূঢ় উদ্দেশ্যের প্রতি মন দেবার প্রয়োজন আছে। পক্ষান্তরে, রূপকনাট্যে প্রতি চরিত্র এ রকম ভাব-মূর্তি না হ'লেও চলে। সমগ্র নাটকের অন্তর্নিহিত তত্ত্বই সেখানে লক্ষণীয়। বিশিষ্ট চরিত্রের প্রতীকার্থ সন্ধান সেখানে অপরিহার্য নয়। সাঙ্কেতিক নাটকের ব্যঞ্জনা উভয়ের অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। বাইরের কাহিনী এ'তেও উপলক্ষ্য; অন্তরলোকের সুগভীর কল্পনা ও ভাব-রাজিকে ইঙ্গিতে প্রকাশ করা রচয়িতার অভিপ্রায়। মনোরাজ্যের যে রহস্য, যে অনুভূতি সহজে ভাষায় ধরা দিতে চায় না, তার রূপ-বর্ণনা নয়, রূপাভাস দেওয়া তাঁ'র লক্ষ্য। তাঁ'র অনেক চরিত্র হয়তো পূর্ণতঃ বা অংশতঃ ভাবের প্রতীক। কিন্তু শুধু তাই নয়। তাঁ'র অনেক কথাতেই আছে বচনাতীত 'ধ্বনি'। রূপের মধ্য দিয়ে পাই রূপাতীতের দ্যোতনা; গানের মতই তাঁ'র ভাষা হয় সুরময়, অনির্বচনীয়ের আভায় যা আভাসিত।

অবশ্য, বাংলায় যাকে আমরা সাঙ্কেতিক নাট্য আখ্যা দিয়েছি, ইংরেজীতে তা' 'Symbolic Drama' নামে পরিচিত। ওরই বাংলা অনুবাদ প্রতীকনাট্য। সূক্ষ্ম সঙ্কেত-ব্যঞ্জনা এ নাটকের প্রাণস্বরূপ, সুতরাং সাঙ্কেতিক নাট্য নামই, মনে হয়, সর্বাপেক্ষা সঙ্গত।

৩

কোনও নাটকে কিছু পরিমাণ প্রতীক-লক্ষণ থাকলেই তাকে আমরা প্রতীকনাট্য বলতে পারিনা। যাকে 'টাইপ-চরিত্র' বলি, সে তো অনেকাংশেই প্রতীক-লক্ষণাক্রান্ত এবং তেমন চরিত্র তো কত নাটকেই রয়েছে। দৃষ্টান্তরূপে নিতে পারি রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'। গোবিন্দমাণিক্য আর রঘুপতি প্রায় প্রতীক—একজন হৃদয়ধর্মের, আর একজন আচারধর্মের। তা ব'লে 'বিসর্জন' প্রতীক-নাট্য নয়।

শেক্স্পিয়রের ম্যাক্‌বেথ্-কে উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক ব'লে মনে করা যেতে পারে। ডাইনীদের প্রলোভনের, হ্যাম্‌লেট্‌কে কল্পনা-প্রবণতার এবং লীয়র-কে স্নেহান্ধতার প্রতীক রূপে গণ্যকরা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। অথচ 'ম্যাক্‌বেথ্' 'হ্যাম্‌লেট্' বা 'কিং লীয়র'কে আমরা প্রতীকনাট্য বলিনা।

যে নাটক সর্বাংশে প্রতীকভাবে অনুস্যূত, তাই প্রতীকনাট্য। পূর্বে বলেছি প্রতীকনাট্য, রূপকনাট্য এবং সাঙ্কেতিকনাট্য—এ তিনের ভেদরেখা সুস্পষ্ট নয়। অনেকে একই অর্থে কথা তিনটিকে ব্যবহার করেন।

৪

এ জাতীয় নাটকের সার্থকতা কোথায়? সাধারণ নাটকের মত এতে সত্যকার জীবনচিত্র ফুটিয়ে তোলা নাট্যকারের উদ্দেশ্য

নয়। কতকগুলি ভাবকে পাত্রপাত্রীর রূপ দিয়ে নাট্যকার তাঁর মনোগত তত্ত্ব বা কল্পনাকে প্রকাশ করতে চান, প্রত্যক্ষের মধ্যে রূপ দিতে চান অপ্রত্যক্ষকে। বস্তুতঃ এর চরিত্রগুলি প্রকৃত মানব-মানবী নয়, ভাবের কল্পিত মূর্তিমাত্র।

অথচ উৎকৃষ্ট নাটকে আমরা আশা করি জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত, সুখদুঃখতরঙ্গায়িত সংসারের দৃশ্য। রূপক বা সাঙ্কেতিক নাট্যকারকে তাই কতকটা অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হ'তে হয়। যারা সংসারের মানুষ নয়, ভাব কিংবা তত্ত্বমাত্র, তাদের ক'রে তুলতে হয় সজীব শরীরী রক্তমাংসের মানুষের মত, আর রূপক তাৎপর্য সত্ত্বেও ঘটনা সাজাতে হয় যথাসম্ভব স্বাভাবিক ও প্রাণোদ্বেল ক'রে।

রবীন্দ্রনাথ এই অসাধ্যসাধনে অনেকাংশে সফল হয়েছেন। তাঁর নাটক, বিশেষ ক'রে সাঙ্কেতিক নাটক সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য মধ্যে মধ্যে শোনা গিয়েছে। কিন্তু মন্তব্যকারীরা রূপকনাট্যের স্বাভাবিক গণ্ডী বা অসুবিধার কথা হয়তো ভালো ক'রে ভেবে দেখেননি।

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ কবি, সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধারণ নাটকের পক্ষে যাই হ'ক, রূপকনাটকের পক্ষে তাঁর কবিত্ব ও ভাবাত্মিকা প্রতিভা প্রতিকূল হয়নি, কেননা রূপক-নাটক ভাবাত্মক। কবিকল্পনার মায়াস্পর্শে মনে লাগে রহস্যের ঘোর। কবিত্বগুণেই তিনি বাস্তবের স্থূলতা পরিহার ক'রে তার প্রাণালোককে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন ভাবের আকাশে। অথচ নাট্যবর্ণিত নরনারীর জীবনে আমরা পাই মানবীয় সুখদুঃখের স্বাদ। ভাব ও রূপ যেন মিশে গিয়েছে সুর আর কথার মত, দূর দিগন্তের মাটি আর আকাশের মত।

৫

'রক্তকরবী' রচনার কয়েকবৎসর পূর্বেকার 'বিজয়ী' কবিতায় ওর ভাবাভাস ফুটে উঠেছে, আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে কথাটা বারে বারে কবির মনে জেগেছে। ১৩২৪-এ প্রকাশিত 'ছোট ও বড়' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন:

"পৃথিবীর সেই ভাবীযুগ আসিয়াছে, অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রকে দাঁড়াইতে হইবে।"

ঐ সময়ে আমেরিকায় ও জাপানে কবি যন্ত্রের প্রাদুর্ভাব এবং শক্তির মত্ততা দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মার্কিন প্রেস্-রিপোর্টারকে তিনি বলেছিলেন, "যখন জীবনেব সম্মুখীন হওয়া যায়, তখন কলের কোন স্থান দেখা যায়না। দিন আসিবে, যখন আমেরিকা মানবের চরম আদর্শের জন্য তৃষিত হইবে।" (রবীন্দ্রজীবনী: শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়) জাপানের স্বাজাত্যদম্ভেরও সেদিন তিনি নিন্দা করেছিলেন।

যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নাটকের মধ্য দিয়েও পূর্বেই ঘোষিত হয়েছে 'মুক্তধারা'-য়। 'রক্তকরবী'তে সেই প্রতিবাদ নূতন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। যন্ত্র আজ মানুষকে অমানুষ ক'রে তুলেছে, তার দৃষ্টিকে করেছে আচ্ছন্ন, হৃদয়কে অবরুদ্ধ। খনির তলা থেকে যারা সোনা তুলে আনছে, তাদের ব্যক্তিপরিচয় গিয়েছে হারিয়ে, নম্বর তাদের একমাত্র চিহ্ন। কাজ, কাজ, কাজ, সে কাজে নেই তাদের মনের আনন্দ, হৃদয়ের তৃপ্তি; শুধু দিনের পর দিন তারা প্রাণহীন নিয়মকে মেনে চলেছে। যক্ষরাজের জালাবরণ আচ্ছন্ন করেছে আকাশকে, তাকে লঙ্ঘন ক'রে পৌঁছোতে

পারেনা সূর্যচাঁদের আলো। এই 'জালাবরণ' মুহূর্তে মনে এনে দেয় টেলিগ্রাফ টেলিফোনের অসংখ্য তারে আচ্ছন্ন আধুনিক নগরের চিত্র। প্রকৃতির রূপের প্রবাহ বাধা পেয়ে ফিরে যায় এখানকার কৃত্রিমতার প্রাচীরে। মানুষও হারাচ্ছে তার হৃদয়ের সৌকুমার্য, তার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দশক্তি।

হৃদয়ের স্নিগ্ধ সৌকুমার্য, প্রাণের সহজ মাধুরী রূপ নিয়েছে নন্দিনী'তে। আধুনিক প্যাশ্চাত্য সভ্যতার বিরাট্ কলকারখানা, বিপুল উপকরণসম্ভার, উদ্ধত বলদর্প, নিরবকাশ কর্মব্যস্ততা সাময়িক-ভাবে মোহগ্রস্ত করলেও বিনাশ করতে পারেনি মানুষের অন্তরকে, কোনদিন পারবেওনা। যন্ত্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ ক'রে দিয়ে মানুষের প্রাণ-ধর্ম একদিন আত্মপ্রকাশ করবেই।

প্রকৃতির সঙ্গে সহজ যোগ আজ ছিন্ন হয়েছে মানুষের। একালের শহুরে সভ্যতা মাটির স্পর্শ থেকে তাকে ক'রেছে বঞ্চিত, চোখের সামনে থেকে কেড়ে নিয়েছে আকাশ, ধোঁয়ায় কালিতে ঢেকে দিয়েছে তার নিঃসীম নীলিমা। "লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তরে" দৃষ্টি অবরুদ্ধ। গাছের শোভা, ফুলের বাহার বিদায় নিয়ে গেছে দূরে। "রক্তকরবী এখানে সহজে মেলেনা।" ('কিশোর'-এর উক্তি)। সপ্ততল অষ্টতল শততল গৃহের কক্ষে কক্ষে মানুষের অবিশ্রান্ত আনা-গোনা। সিঁড়িতেও উঠতে হয়না পায়ে হেঁটে, আছে লিফ্‌ট্। আকাশের আলোয় নয়, বিজলীবাতিতে ঘর হয় উজ্বল। মলয়-সমীর বেঁচে থাক্ কাব্যে, আপাততঃ বিজলীপাখার হাওয়ায় সে দূর করে তার ক্লান্তি। স্বাভাবিক দেহসৌন্দর্যে অবহেলা, কৃত্রিম প্রসাধনে তার আসক্তি। চলাফেরা কথাবার্তা, সকল ব্যাপারে এসেছে কৃত্রিমতা। ভোগলালসার আগুনে শুষ্ক হয়ে উঠেছে হৃদয়ের স্নেহ প্রেম অনুকম্পা।

শ্রেণীতে শ্রেণীতে পুরুষে নারীতে দ্বন্দ্ব। অন্ধ শক্তির উত্তেজনায় মানুষ দিশাহারা। মনের সঙ্গে মেলেনা মন। রুটির লড়াই, দাবির লড়াই চল্‌ছে অনুক্ষণ। আড়ম্বর, আস্ফালন, ব্যস্ততার অন্ত নেই, কিন্তু "ততঃ কিম্ ?"

শান্তিহারা শ্রীহীন এই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্তর-পুরুষই যক্ষপুরীর রাজা। পৌরুষদম্ভ সত্ত্বেও হৃদয়ে তা'র গভীর অতৃপ্তি। সেইখানে তার দুর্বলতা। জালাবরণের বাইরে এনে নন্দিনী তাকে ক'রেছে উদ্ধার। স্বরচিত কারাগার ভেঙে সে বেরিয়ে এলো মুক্ত আকাশের তলে। মিল্‌ল সকল মানুষের সঙ্গে মিথ্যা ব্যবধান ভুলে'। জড়-শক্তির উপর প্রভুত্ব করতে গিয়ে মানুষ হ'য়েছিল তার বশীভূত। কিন্তু মনুষ্যত্ব মর্‌লনা, যন্ত্রের উপরে হ'লে জয়ী, আত্মার হ'ল পরিত্রাণ।

৭

সামঞ্জস্যেই সৌন্দর্য। প্রকৃতির সঙ্গে মিলনে এবং পরস্পরের ভালোবাসার যোগে মানবজীবনের শ্রী ও কল্যাণ। রবীন্দ্রনাথের এ উপলব্ধি অতিগভীর এবং সমগ্রজীবনব্যাপী। কাব্যে, গানে, কর্মসাধনায় তার অসংখ্য প্রমাণ।

যক্ষপুরী যন্ত্রপুরী, 'মরাধনের' দেশ, তার রুদ্ধদ্বারে ভেসে আসে ফসলক্ষেতের গান, প্রকৃতির প্রাণ-জাগানো সুর। জীবনের আনন্দমূর্তি নন্দিনী এসে ডাকে রাজাকে। বলে : "পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিষ আপনি খুসি হ'য়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য ব'লে ছিনিয়ে নিয়ে আসো, তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আসো।"

নেপথ্যেঃ অভিসম্পাত ?

নন্দিনীঃ হাঁ, খুনোখুনি, কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।

পৃথিবীকে ভেঙেচুরে যে দানবীয় শক্তি আজ ঐশ্বর্য আহরণে ব্যাপৃত, এবং যার লোভের দৌরাত্ম্যে মানুষে-মানুষে ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত বিদ্বেষ উত্তরোত্তর তীব্র হ'য়ে উঠছে, তার উগ্রতা, মূঢ়তা, কদর্যতা কবিকে করে ব্যথিত। "যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো ক'রে তুলে পশ্চিমসমাজে মানবসম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে।*** মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার আশ্চর্য সফলতা আছে; তাতে পণ্যদ্রব্য রাশীকৃত হয়, বিশ্ব জুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ ক'রে কোঠাবাড়ি ওঠে। *** ধন হয় সমাজের রথ, ধনী হয় সমাজের রথী, আর শক্ত বাঁধনে বাঁধা মানুষগুলো হয় রথের বাহন।** তা হোক্, কিন্তু এই কুবেরের রথযাত্রায় মানুষের আনন্দ নেই, কেননা, কুবেরের 'পরে মানুষের অন্তরে ভক্তি নেই।*** পশ্চিম দেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হ'য়ে ঘনিয়ে এসেছে, এ কথা সুস্পষ্ট।" (শিক্ষার মিলন : রবীন্দ্রনাথ)

কেবল বঞ্চিতদের বিদ্রোহ নয়, লোভীদেরও অশান্তির আগুন এ সভ্যতার অভ্যন্তরে ফাটল ধরিয়েছে। তারাও ভাবতে বাধ্য হ'চ্ছে, "সব পেয়েও কেন কিছু পাইনা? স্তূপীকৃত ঐশ্বর্যসত্ত্বেও হৃদয়ের তৃষ্ণা কেন মেটেনা?"

রাজার মুখে তাই শুনি: "আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি; তোমার মত একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি—আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। *** একদিন দূরদেশে আমারই মত একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারিনি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। একদিন গভীর

রাতে ভীষণ শব্দে শুনলুম, যেন কোন দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুমরে গুমরে হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নীচে তলিয়ে গেছে।"

৮

পাহাড় মাটির নীচে তলিয়ে গিয়েছিল, ভেঙে পড়েছিল তার তার স্পর্ধার চূড়া। রাজার অভিমানও তেমনি গিয়েছিল চূর্ণ হ'য়ে, সে নেমে এসেছিল মাটিতে তার সৌধশিখর থেকে "চরম প্রাণের সন্ধানে।"

দীর্ঘকাল লোভের দৃষ্টিতে সে জগৎকে দেখেছে বিকৃত ক'রে, প্রাণের সহজ আনন্দকে করেছে অস্বীকার, কঠোর নিয়মশৃঙ্খলে বেঁধেছে নিজেকে, বাঁধতে চেয়েছে প্রজাদের। 'কলের নিয়ম' পালনে তার প্রাণান্ত প্রয়াস। মুক্তির পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত চলেছে তার ধ্বজা-পূজা, অভ্যাসের অনুবৃত্তি, বাঁধারীতির আনুগত্য। আধুনিক কালের কৃত্রিম সভ্যতা ধ্বজাপূজাতেই বিশ্বাসী। তার কাছে প্রাণের চেয়ে নিয়ম বড়, বস্তুর চেয়ে চিহ্ন বড়, কাজের চেয়ে ঠাট বড়। জীবনের বহিরঙ্গকে সে সত্যের চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করে।

নন্দিনীর ডাকে শেষ পর্যন্ত রাজা সাড়া না দিয়ে পারেনি। একদিন সে ভেবেছিল, "আমার প্রতাপ করবে জগৎ গ্রাস," তাই "গড়েছিল রজনীদিন লোহার শিকলখানা।" কিন্তু

"গড়া যখন শেষ হয়েছে কঠিন সুকঠোর
দেখি আমায় বন্দী করে আমারি এই ডোর।" (খেয়াঃ 'বন্দী')

নবজীবনের আগ্রহে বন্ধন ছিন্ন ক'রে সে এল বেরিয়ে। তার প্রতাপ যে কত নিরর্থক, তা আজ সে মর্মে মর্মে অনুভব করেছে।

প্রাসাদদ্বারে প'ড়ে আছে রঞ্জনের দেহ, রাজপ্রতাপের কাছে যে মাথা নোয়ায়নি সেই রঞ্জন, নন্দিনীর প্রণয়ী রঞ্জন।

কাতরকণ্ঠে নন্দিনী বলে: "রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও। সবাই বলে তুমি জাদু জান, ওকে জাগিয়ে দাও।"

রাজা বলে: "আমি যমের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারিনে, জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি।"

সত্যই, বাঁচবার বা বাঁচাবার শিক্ষা তো দেয়নি আমাদের একালের সভ্যতা। শিখিয়েছে দুর্বলের হাত থেকে দেবতার দান ছিনিয়ে নিতে, পৃথিবীর কোণায় কোণায় মারণাস্ত্রের ঘাঁটি বসাতে আর প্রকৃতির মুখে আপন লালসার কালিমা মাখিয়ে দিতে। এই বিকৃতি থেকে মানুষকে উদ্ধারের জন্যই প্রাণ উৎসর্গ করেছে রঞ্জন। সৌন্দর্যময়, প্রেমময়, আদর্শদীপ্ত যৌবনের প্রতীক সে। সার্থক শক্তির গৌরব তারই, রাজার নয়। রাজা বলে:

"আমার যা আছে, সব বোঝা হ'য়ে আছে। শক্তি যতই বাড়াই, যৌবনে পৌঁছল না।" যৌবনের জাগরণ সৌন্দর্যের মন্ত্রে, প্রেমের মন্ত্রে, হিংসার অস্ত্রে নয়। সুন্দর দেবতা দেখা দেন শুধু সৌন্দর্যের পূজারীকে। "সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, বীণার তার বাজেনা, ছিঁড়ে যায়।"

যে যৌবনশক্তির প্রতি তার লোভ, অন্ধ অহঙ্কারে তাকেই সে হেনেছে আঘাত;—"আমি যৌবনকে মেরেছি—মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।"

রঞ্জনের প্রতি তার ঈর্ষ্যা। রিক্ত হয়েও সে যে পরম সুন্দর, নন্দিনীর প্রিয়, সকলের প্রিয়। রাজৈশ্বর্য লজ্জায় ম্রিয়মাণ তার সম্মুখে। হাসি দিয়ে সে জয় করেছে দেশ, রাজপ্রতাপকে করেছে

পরাভূত। কোথায় পেলো রঞ্জন এ জয়ের মন্ত্র, কোথায় শিখ্‌ল এ জাদু?

শক্তিদম্ভী চেনেনা আত্মার এই অনায়াস শক্তিকে—প্রাণঝর্‌নার নিত্যনির্মল ধারাকে—চিরযৌবনের লীলা-উচ্ছল প্রবাহকে। কিন্তু যুগে যুগে রাবণ, হিরণ্যকশিপু আর নীরোর শত অত্যাচারকে পরাস্ত ক'রে এই শক্তি হয়েছে জয়ী।

৯

প্রাণশক্তির প্রাচুর্য নিয়ে আসে যৌবন। সৌন্দর্যে, প্রেমে তার সার্থকতা। পৌরুষে আর নারীত্বে তার যুগ্ম রূপ। দুইয়ের মিলনেই পরিপূর্ণতা। নারী দেয় প্রেরণা, সান্ত্বনা, সুষমা; পুরুষ আনে বীর্য, ত্যাগ, দৃঢ়তা। নন্দিনী আর রঞ্জন একই ফুলের দুই পাপড়ি।

আদর্শনারী শ্রীময়ী, কল্যাণরূপিনী। তার লাবণ্যস্পর্শে, প্রেমস্পর্শে পৌরুষ হয় সুন্দর। শ্রীহীন পৌরুষের কদাকার রূপ দেখি যক্ষরাজে, আর শ্রী-মণ্ডিত পৌরুষ মূর্ত হয়েছে রঞ্জনে।

কবি বলেছেন: "রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী ব'লে একটি মানবীর ছবি।" অবশ্য এ মানবীও প্রতীক। যন্ত্ররাজ্যে সে এনেছে চাঞ্চল্য, প্রাণের বেগ, হৃদয়ের আবেগ। সুপ্ত মানবতা উঠেছে জেগে। অধ্যাপকের মনে লেগেছে দোলা, বিশু মেতেছে গানে, ফাগুলালের চোখেও লেগেছে নতুন নেশার ঘোর।

আর কিশোর? সংসারের মলিনতা স্পর্শ করেনি তাকে, আশাদীপ্ত স্বপ্নদৃষ্টি মেলে সে তাকায় পৃথিবীর পানে। আসন্ন-যৌবন-রাগে রঙিন তার মন, অনাবিল বিশুদ্ধ প্রেমে উদ্ভাসিত। উচ্ছ্বসিত জীবন-তরঙ্গ তার ভেঙে পড়তে চায় কোন্ দুর্লভ আদর্শের তটে। নাটকের আরম্ভেই নন্দিনীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ।

নন্দিনী।...এখানকার জানোয়ারেরা তোকে শাস্তি দেয়, আমার যে বুক ফেটে যায়।

কিশোর। সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি ক'রে আমারই হ'য়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন।

* * *

নন্দিনী। কিন্তু তুই একটু সামলে চলিস।

কিশোর। না, আমি সামলে চলবনা, চলবনা। ওদের মারের মুখের ওপর দিয়েই তোমাকে রোজ ফুল এনে দেব।"

(অবুঝ বেহিসেবী এদের ভালোবাসা। নির্মল, নিষ্পাপ এদের জীবন। এরা নেয় দুরূহ ব্রত সাধনার ভার—দ্বিধাহীন নির্ভীক চিত্তে। দুনিয়ার রূঢ়তা, নৃশংসতা, কপটতার সন্ধান পায়নি এরা, বিষের ঝাঁজে ঝিমিয়ে পড়েনি এদের মন। এদের কথাই তো বলেছেন কবি 'প্রশ্নে':

"আমি যে দেখেছি তরুণ বালক উন্মাদ হ'য়ে ছুটে
কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।"

'বর্ষশেষে' নবজীবনের দেবতাকেও আবাহন করেছেন কবি কিশোর-মূর্তিতে:

"হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী
করহ আহ্বান
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব
অর্পির পরাণ।"

১০

গোকুল। একটা কী মন্তর আছে তোমার। ফাঁদে ফেলেছ সবাইকে। সর্বনাশী তুমি। তোমার ঐ সুন্দর মুখ দেখে যারা ভুলবে, তারা মরবে।

আদর্শ জীবনের মায়া যাদের ভোলায়, মৃত্যুকে তারা হাসিমুখে বরণ ক'রে নেয়। তাই তো জীবন-দেবতাকে কবি বলেন :

"তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে ?
জানিনা কি, মরণ নাচে, নাচে গো ঐ চরণমূলে।"

গোকুল। দেখি, দেখি, সিঁথিতে তোমার ঐ কি ঝুলছে।

নন্দিনী। রক্তকরবীর মঞ্জরি।

রক্তকরবী—উগ্র লাল নয়, রাঙা করুণ তার রং, প্রেমে রাঙা, আত্মদানের রক্তে রাঙা। শাদা ফুলে থাকুক শুচিতা. কোথায় প্রাণের রং, অনুরাগের আভা ? যে জীবন মহিমান্বিত ত্যাগে, প্রীতিতে, সুন্দর নিষ্কলুষ যৌবন-বিভায়, তাকেই তো চেয়েছে রঞ্জন, তারই প্রভাব ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে নিরুদ্ধ-প্রাণ যক্ষরাজের দেশে। "প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ ক'রে সে হারজিতের খেলা খেলে।" শেষ বিদায়ের কালে সে রেখে গেছে তার প্রেমের চিহ্ন 'রক্তকরবীর কঙ্কণ'—আপন রক্তে রাঙিয়ে।

রক্তকরবীর অর্থের ইঙ্গিত করেছে নন্দিনী : "রঞ্জন আমাকে কখনো কখনো আদর ক'রে বলে রক্তকরবী। জানিনে, আমার কেমন মনে হয়, আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রং রাঙা, সেই রং গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।"

জীবনের আনন্দ-প্রতিমা নন্দিনী, তাকে যে ভালোবাসে, বুকের রক্ত দিয়ে সে করে তার পূজা।

"হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপচারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি' প্রাণ।"

"চিত্রা"—'এবার ফিরাও মোরে'

এই নন্দিনীই কি রূপান্তরে কবির 'মানসী', 'মানস-সুন্দরী', 'নিরুপমা সৌন্দর্য প্রতিমা' হ'য়ে দেখা দেয়নি?

১১

রাবীন্দ্রিক জীবন-দর্শনের মূল কথাটি কি? অন্তরের সহজ ধর্মকে যেখানেই অস্বীকার করি, সেখানেই আমরা অকল্যাণকে ডেকে আনি। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে,' 'বিসর্জনে', 'ডাকঘরে' আমরা এই সত্যকে বিভিন্ন বেশে দেখেছি। 'মুক্তধারা' আর 'রক্তকরবী'তেও একই সত্যের প্রকাশ। উভয় নাটকেই দেখানো হয়েছে, প্রকৃতি আর জীবনের বিচ্ছেদের ফলে আধুনিক সভ্যতায় জ'মে উঠেছে প্রচুর জঞ্জাল, এসেছে সুগভীর অশান্তি। কিন্তু আজকের এই বিকৃতিই শেষ কথা নয়। আনন্দ থেকে প্রাণের উৎসার, আনন্দময়ী নন্দিনী হবে একদিন জয়ী। আর তা'র সহচর রঞ্জন—আদর্শ প্রেমে যার প্রতিষ্ঠা—অজেয় তার শক্তি। ধনান্ধ যন্ত্রশাসিত সভ্যতার দেশেও কোথায় অলক্ষিতে ঘটে তার আবির্ভাব, শত লাঞ্ছনায় অবিচলিত থেকে কেমন ক'রে সে ছড়িয়ে দেয় আপন প্রভাব। মরণেও সে অমর।—

"মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর 'আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে—ও কখনো মরতে পারেনা।"

যক্ষপুরীর পাষাণ ভেদ ক'রে ফোটে ভালোবাসার ফুল—'রক্তকরবী'—সেই ফুলে সে রেখে যায় তার স্মৃতিচিহ্ন।

রঞ্জনও প্রতীক। জনৈক প্রেমিকমাত্র নয়, সে প্রেমের শক্তি। যাকে পেলে "তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা"-সে-ই তার কাছে দেখা দিয়েছে নন্দিনীমূর্তিতে।

১২

"যক্ষপুরীর রাজার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের ঐক্য কেউ প্রত্যাশা করেনা। এইটুকু জানি, যে এঁর একটি ডাকনাম আছে—মকররাজ।* * * রাজমহলের বাহির দেয়ালে একটি জালের জানলা আছে। সেই জালের আড়াল থেকে মকররাজ তাঁর ইচ্ছামতো পরিমাণে মানুষের সঙ্গে দেখাশোনা ক'রে থাকেন।" (নাট্যপরিচয়) মকর যেমন কচিৎ জলের উপরে উঠে একটুখানিক বাইরের হাওয়া নেয়, মকররাজও তেমনি কদাচিৎ একটিমাত্র জানলা দিয়ে বাইরে তাকান। আধুনিক যন্ত্রপুরীতে মানুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেশেনা মানুষ। প্রকৃতির সঙ্গেও রাখেনা যোগ—বিশেষতঃ যারা উপর-মহলের। তারই নিদর্শন এই মকররাজের আচরণে। তত্ত্বকে আড়াল ক'রে রূপকথা রচনার নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে এ নাটকে।

প্রসঙ্গক্রমে কবি বলছেন: "হঠাৎ মনে হ'তে পারে রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষতঃ যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হ'ল আরাম, শান্তি; রাবণ হ'ল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর, আর একটিতে শান বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়।"

রূপক নয়, একথার তাৎপর্য কি? রামায়ণ কাহিনীর তিনি তো অনেকটা রূপক-ব্যাখ্যাই ক'রেছেন।

"কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় ক'রে দিচ্ছে।' তা ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মত। ......নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ ক'রে নিয়েছিল, সেটা কি সেকালের কথা না একালের? ......তখনো কি সোনার খনির মালেকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধরে টান দিয়েছিল?

"আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষী যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারি বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন?"

তা হ'লেই দেখছি, নাট্যকার ইঙ্গিত করছেন, রামায়ণে, তথা রক্তকরবীতে কৃষিমূলক সভ্যতার শ্রী, কান্তি ও কল্যাণরূপ ফুটে উঠেছে। ফসল-ক্ষেতের গানেই তো রক্তকরবীর ভাব-সঙ্কেত।

'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে সীতাকে রবীন্দ্রনাথ কৃষিসভ্যতার প্রতীক-রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। জনক-রাজা ছিলেন কৃষি-কুশল। তাঁর মানসী কন্যাকে অর্থাৎ কৃষি-সভ্যতা-প্রচারের ব্রতকে তিনি সমর্পণ করেছিলেন রামচন্দ্রের হাতে।

দেশের, অহল্যা পাষাণীভূমি তাঁর পদস্পর্শে হয়েছিল সঞ্জীবিতা, শস্যসমৃদ্ধা। 'রক্তকরবী'র অন্তরালে যে প্রকৃতি ও যন্ত্রের, প্রাণ ও নিয়মের, আনন্দ ও দম্ভের বিরোধের কথা নিহিত আছে, তা পড়লেই বোঝা যায়। নন্দিনী, রঞ্জন, যক্ষরাজ—এরা কাহিনীটির রূপক অর্থের দিকে ইশারা করছে। তা' ব'লে যদি মনে করি, এতে রূপক অর্থ ছাড়া আর কিছু নেই, তবে নাটকখানির প্রতি অবিচার করা হবে। কেবলমাত্র তত্ত্ব নিয়ে কোনও নাটক বা আখ্যান জমেনা, যদি তাতে জীবনের চিত্র ফুটে না ওঠে। বর্ণিত নরনারীর মধ্যে প্রাণস্পন্দন অনুভব করা চাই। রামায়ণে সেই প্রাণস্পন্দন অনুভব করি ব'লেই সীতাকে কেবলমাত্র কৃষিসভ্যতার প্রতীক ব'লে ভাবিনা। রূপক-সঙ্কেত প্রচ্ছন্ন থাকলেও রামায়ণের আখ্যানে মানব-হৃদয়ের স্পর্শ পাই। তেমনি নন্দিনী শুধু তত্ত্বরূপে দেখা দেয়নি নাটকে, সে এসেছে নারীর সৌকুমার্য ও প্রেম নিয়ে, লীলাকৌতুক ও আত্মিক শক্তি নিয়ে। সকল চরিত্রের মধ্যেই ফুটেছে মানবিকতা। কাহিনীতে আছে অনেকটা বাস্তবধরণের ঘটনাবিন্যাস। তাই 'রূপক নাট্য' নামে এর পূর্ণ পরিচয় মেলেনা। নিরবচ্ছিন্ন বাস্তবতা আমরা আশা করতে পারিনা সাঙ্কেতিক নাটকে। ইশারা-ইঙ্গিত, ঈষৎ স্বপ্নময় ভাব এতে অপরিহার্য। তথাপি সত্যকার জীবনের ধ্বনি বেজে ওঠে সার্থক সাঙ্কেতিক নাটকে, মানবীয় সুখদুঃখের তরঙ্গকল্লোল ভেসে আসে হৃদয়ের দ্বারে।

১৩

"যাঁহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা, সমস্ত বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ কোনো কালে পরিশোধ হইবার নহে। তাঁহাদের পরিচয়

বিলুপ্ত হইলে, তাঁহাদের উপদেশ বিস্মৃত হইলে মানবসভ্যতা আপন ধূলিধূমসমাকীর্ণ কারখানাঘরের জনতামধ্যে নিশ্বাসকলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত হইয়া কৃশ হইয়া মরিতে থাকিবে।"

প্রাচীনসাহিত্য—রামায়ণ।

'কারখানা ঘরের বদ্ধ আকাশ' কেমন ক'রে মানুষের শ্বাসরোধ করছে, তার অনবদ্য চিত্র ফুটেছে 'মুক্তধারা'য় আর 'রক্তকরবী'তে। সভ্যতার কল্যাণে পাথর হ'য়ে গেল পৃথিবী, তবু তার বুকে আজও ফুল ফোটে, যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মানবাত্মা। নাটকের অবসানে দেখি, মানবাত্মাই হ'ল জয়ী, বীর প্রেমিকের আত্মদানে যন্ত্রযুগ ত্রাণ পেলো তা'র যান্ত্রিকতা থেকে।

অসংখ্য সূক্ষ্মসঙ্কেতে কবির নাটক পরিপূর্ণ। নাট্যপরিচয়ে মকররাজের বায়ুসেবনভঙ্গীর বর্ণনা চমৎকার ব্যঞ্জনাময়। পাত্র পাত্রীদের উক্তিপ্রত্যুক্তি অসংখ্য ইঙ্গিতে ভরা। এইকারণেই সাঙ্কেতিক নাটক নাম এর পক্ষে সম্পূর্ণ সার্থক। আত্মার শক্তি, প্রেমের শক্তি নিয়ে এসেছে রঞ্জন। এ শক্তিকে সহজে মানতে চায়না যন্ত্রদাস বর্বর মানুষ। তাই অধ্যাপক বলেন: "দেবতার হাসি সূর্যের আলো, তাতে বরফ গলে, কিন্তু পাথর টলেনা।"

তবু ব্যর্থ হয়না এ দেবতার হাসি। ইতিহাসে বারেবারে দেখা গিয়েছে, আত্মার শক্তিই শেষ পর্যন্ত হয় জয়ী। দানবের পাষাণ প্রাচীর ভেঙে পড়ে দেবতার হাসির ঘায়ে।

অধ্যাপক। কতবার ভেবেছি, তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পর, তা'র একটা কিছু মানে আছে।

নন্দিনী। আমি তো জানিনে কী মানে।

অধ্যাপক। হয়তো তোমার ভাগ্যপুরুষ জানে। এই রক্ত আভায় একটা ভয়লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য নয়।

আপাতদৃষ্টিতে করুণ কোমল হ'লেও আত্মার শক্তি অমোঘ। তার পবিত্র জ্যোতিঃ স্পর্শে বাহুবলের সকল দম্ভ, সকল কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রজাল মুহূর্তে যায় ছিন্ন হয়ে উষালোকে নৈশ অন্ধকারের মত।

প্রেমের যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে রঞ্জন-নন্দিনীর জীবনে তা নরনারীর সামান্য আসক্তিবন্ধন মাত্র নয়, নয় সে মোহচঞ্চল দুর্বল প্রেম। যে প্রেম অভয়মন্ত্রে প্রেমিককে করে উদ্দীপিত, কঠিন তপস্যায় করে উদ্বোধিত, এ সেই প্রেম। এই প্রেমের বলেই প্রেমিক নির্ভয়ে বলতে পারে:

> "ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি,
> মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে বলিব, তুমি আছ, আমি আছি।"

১৪

সভ্যতার সঙ্কট-ক্ষণে আজ জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগছে আমাদের মনে। জীবনযাত্রাকে সহজ করতে গিয়ে আমরা তা'কে অতিশয় জটিল ক'রে তুলেছি। হাতের চেয়ে হাতিয়ার হ'য়ে উঠেছে বড়।

রবীন্দ্রনাথ তাই বারে বারে বলেছেন, অন্তরের দিকে চোখ ফেরাও, কেবল বাইরের দিকে চেয়ে থেকোনা। সোনার তাল যতই কুড়িয়ে আনো, তাতে ভরবেনা মন। ঐ দেখ, 'রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে।' ভালোবাসো প্রকৃতিকে, ভালোবাসো মানুষকে, বিশ্বের সঙ্গে জীবনের সুর মেলাও,—পাবে আনন্দ, পাবে শান্তি।

'রক্তকরবী'তে এই কথাই শুনি—উপদেশ-রূপে নয়, সরস বাণীরূপে। যক্ষরাজ ও রঞ্জন-নন্দিনীর আদর্শ-সংঘাতে ঘনীভূত হয়েছে নাটকীয় দ্বন্দ্ব। আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে জয়ী হয়েছে রঞ্জন। সে জয়ের সাড়া পৌঁছেছে আমাদের অন্তরে, ত'ার আনন্দ-বেদনায় রঙিন হয়েছে আমাদের মন। শুধু তাই নয়। নন্দিনী, কিশোর, অধ্যাপক, বিশু, ফাগুলাল—এরাও উপস্থিত হয়েছে আমাদের সামনে আপন আপন সুখদুঃখ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে। তাই তো এ রূপকনাট্যকে 'শুধুই রূপক' মনে ক'রতে হই কুণ্ঠিত, আংশিকভাবে হ'লেও জীবনের গতিবেগ অনুভব করি এতে। আংশিকভাবে—কেননা, সাধারণ নাটকের অনুরূপ সজীবতা বা বাস্তবতা-বিকাশের পক্ষে এর উপজীব্য ভাব-বিষয় কতকটা প্রতিকূল। পাশ্চাত্ত্য সাঙ্কেতিক নাটক সমূহেও অস্পষ্টতা বা 'বায়বীয়তা' এর চেয়ে কম নয়। মেটারলিঙ্কের 'নীলপাখী' ও 'দৃষ্টিহারা' হাউপ্টম্যানের 'মগ্ন ঘণ্টা' ও 'হানেলে', ইব্‌সেনের 'দাগ' (ব্র্যাণ্ড্) ও 'পীয়ার গিণ্ট', ইয়েট্‌সের 'ক্যাথলিন-নি-হুলিহান' এবং 'মায়াবিনী রাণী' এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। চাণ্ড্লার বলেন: "অন্যান্য শিল্পের চেয়েও অভিনীত নাটকের পক্ষে যে প্রতীকতা বেশী অনুপযোগী, তাতে সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটক সমূহ প্রতীকধর্মী নয়, জীবনধর্মী।" *

★ "That Symbolism, too, is less suited for the acted drama than other forms of Art, there can be no doubt. Certainly the great plays of the world have been representative rather than symbolic—F. T. W. Chandler.

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আর একখানি কাব্যগ্রন্থ

কুটীরের গান—মূল্য ১৷৷০

এই বইয়েরই কবিতা 'রাত ভিখারী' রবীন্দ্রনাথকৃত কবিতা-সংকলন "বাংলা কাব্য পরিচয়ে" স্থান পেয়েছে।

মোহিতলাল :—"এই কয়টি কবিতা আমার ভাল লেগেছে—'মহাকাল,' 'বেহুলা,' 'আজ শরতে,' 'গাঁয়ের স্বপনে ভুলি।' ** 'আজ শরতে' কবিতাটি সব চেয়ে ভাল লাগল। ** 'মহাকাল' কবিতাটিতে ভাষা ও ছন্দের সংযম, শালীনতা এবং গাঢ় গাম্ভীর্য্য ফুটেছে।"

দীনেশচন্দ্র সেন :—"বাংলার পল্লীশ্রীর মত মনোরম এই কবিতাগুলি।"

'দেশ' :—"ধীরেন্দ্র বাবুর কবিতার শান্ত স্নিগ্ধ অনাড়ম্বর এবং অনাবিল সৌন্দর্য্য পাঠকের চিত্তকে আপ্লুত করিয়া একটা অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ দান করে এবং কবিত্ব-প্রতিভার নিবিড় স্পর্শে যে স্বপ্নগুলি জাগিয়া উঠে, তাহাতে কঠোর বাস্তব হইতে মানুষের চিত্ত কল্পলোকের কোন ঊর্দ্ধস্তরে উন্নীত হয়,—কবিত্বের সার্থকতা এই খানেই।"

'আনন্দ বাজার' :—"এইগুলির মধ্যে সুকুমার কাব্য, অতি নরম মাধুর্য্য, মধুর শব্দ ঝঙ্কার এবং স্বচ্ছ ছন্দের গতি রহিয়াছে ; রসিকজন এই 'কুটীরের গানে' তৃপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই"

প্রবাসী' :—"তাঁহার মনে পল্লীস্মৃতি যে শান্ত স্নিগ্ধ মায়া-মধুর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, কবিতাগুলির মধ্যে সেই রূপটি প্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়াছে। "স্বপ্নাকুল দুই নেত্র, হৃদয় অধীর। রণিয়া রণিয়া বাজে সুদূর মঞ্জীর॥" শব্দ ও ছন্দ এমনি একটি স্বপ্নময় ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে।"

Advance (Ang. 26, 1934):—"The command over verse, the trick of happy phrasing, the general polish, and above all, the very clearness of the picture conjured, point to years of training and maturity of imagination."

—